সংস্কৃত স্তোত্রসাহিত্য ও বাংলা ভক্তিগীতি কাব্য সাহিত্যের সম্পর্কসূত্র — একটি সমীক্ষা

তত্ত্বাবধায়ক :

ড: হরিপদ চক্রবর্ত্তী

North Bengal University
Library
Raja Rammohanpur

গবেষক :

শ্রী অনিল চন্দ্র দাস

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি.
উপাধির জন্য নিবেদিত গবেষণাপত্র।

১৯৯৬

ST - VERF

Ref.
81.09
অনি/সাহ

STOCK TAKING-2011

120847

- 3 JUL 1998

নিবেদন

কেন জানি না শিশুকাল থেকেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করতাম। ইংরাজী, অঙ্ক ও অন্যান্য বিষয় থেকে — যেগুলির বাজার - মূল্য অধিক সেগুলি থেকে সংস্কৃত আমার নিকট সমধিক রুচিকর মনে হত। রুচির পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য আর্য সত্য। মহাকবি কালিদাসের উক্তিটি স্মরণ করি —— "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"।

সংস্কৃতের প্রবল আকর্ষণে সকল কর্মের মধ্যেও সময় করে সংস্কৃতে পুরাণ কাব্য - ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে পাশ করলাম, তীর্থোপাধি অর্জন করলাম। এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে নিবেদন করি যে, উত্তরকালে সংস্কৃত পরিষদ (বালুরঘাট) পণ্ডিত সমাজ "বিদ্যাবিনোদ" উপাধি প্রদানে আমাকে গৌরবান্বিত করেন।

কিন্তু কেবল পঠনে মন তৃপ্ত হল না, পাঠন আরম্ভ করলাম —— "প্রাণকৃষ্ণ চতুষ্পাঠী" টোল নক্সীপুর (বালুরঘাট) প্রতিষ্ঠিত করে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ হতে প্রতি বৎসর গড়ে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী কাব্য - ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে "বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের" (কলিকাতা) অধীনে পরীক্ষা দেয় এবং আনন্দের কথা প্রায় সকলেই সফলকাম হয়।

এদিকে কয়েকজন শিক্ষক সহকর্মী বন্ধুর উপদেশে ও আগ্রহে উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বহিরাগত ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হলাম। পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্বেই লক্ষ্য করলাম যে, বাংলা ভক্তি সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতের স্তোত্রাদির যেন গভীর সম্পর্ক আছে। এই নিয়ে কোন গবেষণা করা যায় কি ?

তারপর ১৯৯১ খৃষ্টাব্দের প্রাক্‌ভাগে উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় প্রবীন অধ্যাপক ডঃ শিব চন্দ্র লাহিড়ী, ডঃ সুনীল কুমার ওঝার পরামর্শে এবং ভাটপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবীন ও খ্যাতনামা শিক্ষক ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয়ের আগ্রহে উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের কলিকাতার পাইকপাড়াস্থিত

"চক্রতীর্থ" ভদ্রাসনে একদিন সভয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে প্রণাম জানালাম। আমার সঙ্গে তাঁর কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না। ডঃ লাহিড়ী ও ডঃ ওঝার পরিচয় পত্রের মাধ্যমে পরিচিত হলাম। মুহূর্তে অপরিচিতের ব্যবধান তিরোহিত হল। ভক্তি-সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ দেখালেন, তিনি তখন প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন, চক্ষু চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে মাদ্রাজ শঙ্কর নেত্রালয়ে যাবার কথা। অবশ্যই এই মুহূর্তটি আমার পক্ষে পরম শুভ মুহূর্ত ছিল কারণ এই অবস্থায়ও ভক্তি সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণার ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করতে তিনি সম্মত হলেন। তারপর যথারীতি উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা প্রকল্প উপস্থাপিত করলাম এবং "সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও বাংলা ভক্তিগীতি কাব্য সাহিত্যের সম্পর্ক সূত্র — একটি সমীক্ষা" — শীর্ষক বিষয়টি অনুমোদিত ও নথিভুক্ত হ'ল।

তারপর সুরু হ'ল পুস্তকাদি সংগ্রহ, বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানে, যেমন বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগার, কলেজ গ্রন্থাগার, তিওড় ভারত সেবাশ্রম গ্রন্থাগার, কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি — প্রমুখ সারস্বত প্রতিষ্ঠানে সাহায্যপ্রাপ্ত হলাম। শুধু তাই নয় ব্যক্তিগত ভাবে যে-সমস্ত বিদ্বজ্জন ও শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতমণ্ডলীর সান্নিধ্য ও উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যাঁরা — শ্রদ্ধেয় ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, প্রজ্ঞাভারতী-বাচস্পতি-শাস্ত্রী ঋষিধাম (দত্তপুকুর), ডঃ কুমার নাথ ভট্টাচার্য চতুস্তীর্থ — নবদ্বীপ, শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ — ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। হরিদ্বারের পরিব্রাজক সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী মহারাজ। ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডঃ হীরেন্দ্র নারায়ণ সরকার, জগাছা কলোনী, হাওড়া। তাঁদের প্রত্যেককে সশ্রদ্ধ - সকৃতজ্ঞ - প্রণাম জানাই।

একেবারে নিকট থেকে যাঁরা আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ -উদ্দীপনা দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন — তাঁদেরও সকলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রণতি জানাই। এঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ — স্বর্গীয় পণ্ডিত ভুবণ মোহন দাস, ননীগোপাল ভট্টাচার্য প্রধান শিক্ষক, পতিরাম উচ্চ বিদ্যালয়, স্বর্গীয়া মাতৃদেবী সুভাষিনী দাস। প্রতিনিয়ত

যে আমার পার্শ্বে থেকে সাংসারিক সকল অসুবিধার সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে — পুনঃপুনঃ উৎসাহিত করেছে তাকে — আমার সহ-ধর্মিনী সংস্কৃত ভাষার শিক্ষিকা শ্রীমতী পূর্ণিমা দাসকে গভীর প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করি, তৎসঙ্গে আমার পুত্র-কন্যা — শ্রীমান হরিস্বামী দাস, শ্রীমতী দেবযানী দাস যারা আমাকে পদে পদে কেবল উৎসাহিত নয় নানাভাবে সাহায্য দিয়েছে এবং দিচ্ছে তাদেরও আশীর্বাদ জানাই ।

এ ব্যাপারে বহু সহৃদয় বন্ধু - বান্ধবের অকৃপণ সহায়তা পেয়েছি । স্থানাভাবে তাদের সকলের নাম দিতে না পারার জন্য মর্মাহত । তাদের সকলকেও আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ।

পরিশেষে শ্রদ্ধার সঙ্গে সবিনয়ে স্মরণ করি আমার তত্ত্বাবধায়ক পিতৃপ্রতীম অধ্যাপক ড: চক্রবর্তীকে । তাঁকে ধন্যবাদ প্রদানের মতো ধৃষ্টতা যেন আমার না হয় । তাঁর অকৃপণ অপার স্নেহের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে যে উজ্জ্বল আনন্দ পেয়েছি তা আমার জীবনের চিরন্তন পাথেয় হয়ে থাক্ ইহাই একমাত্র প্রার্থনা । তাঁকে জানাই বার বার প্রণাম ।

শ্রী অনিল চন্দ্র দাস

বিষয়-সূচী

		পত্রাঙ্ক
প্রথম অধ্যায় —		
	স্তোত্র সাহিত্যের ভূমিকা —	১ - ১১
দ্বিতীয় অধ্যায় —		
	স্তোত্র সাহিত্যের বৈচিত্র্য শ্রেণী বিন্যাস —	১২ - ২২
তৃতীয় অধ্যায় —		
	সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও বাংলা আদি-মধ্য যুগ —	২৩ - ৬৮
চতুর্থ অধ্যায়		
	সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও উনবিংশ শতাব্দীর ভক্তি-গীতিকাব্য —	৬৯ - ১০০
পঞ্চম অধ্যায় —		
	উপসংহার —	১০১ - ১০৯
পরিশিষ্ট —	(ক) স্তোত্র সাহিত্য ও ভক্তি-গীতি কাব্যের কিছু নির্বাচিত সংকলন — সংস্কৃত ও বাংলা	১১০ - ২০৩
	(খ) গ্রন্থপঞ্জী —	২০৪ - ২১৪

প্রথম অধ্যায়

স্তোত্র সাহিত্যের ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

স্তোত্র সাহিত্যের ভূমিকা

জড় ও জীব দিয়ে গঠিত — এই প্রত্যক্ষ গোচর বিশ্ব ব্রহ্মান্ড। কিন্তু যেখানে তার স্থিতি অর্থাৎ মহাকাশ আর যা ঘটায় তার গতি অর্থাৎ মহাকাল — দুইটিই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগোচর। বুদ্ধির বিচার-বিশ্লেষণে ও বোধির স্বয়ংপ্রভ আলোকে তার স্বরূপের সন্ধান পায় মানুষ। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টি হল কেমন করে ও কেন? নিষ্প্রাণ জড়ের বুকে প্রাণ ও চেতনার আবির্ভাব হল কী ভাবে এবং কেন? — এই সদা-উদ্যত প্রশ্নাবলী নিয়ে সুদীর্ঘ কাল থেকে হয়ত মানব সৃষ্টির ঊষাকাল থেকেই মানুষ ভেবেছে — ভেবে চলেছে — কবি-দার্শনিক, ধ্যানী-জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক-ধর্মাচার্যগণ — সকলেই তার উত্তর খুঁজেছেন, খুঁজে চলেছেন। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই কোন সর্ব-সম্মত উত্তর মেলেনি।

তবে আদিম মানবগোষ্ঠীর জিজ্ঞাসুগণ এ সম্বন্ধে কী ভেবেছিলেন তার একটা নমুনা পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে। সর্বধ্বংসী মহাকালের বিরামবিহীন প্রচন্ড আক্রমণের মধ্যে মানব মনীষার যে প্রাচীনতম সম্পদটি নিদর্শন রূপে রক্ষিত হয়েছে — সীমাহীন সমুদ্রের বুকে উন্নত শির পর্বত শৃঙ্গের মতো — তা বৈদিক সাহিত্য। দ্রষ্টা বৈদিক ঋষিগণ — নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজেছেন ও তা আশ্চর্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

বৈদিক ভাবনায় বিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনাসূত্রটি পাওয়া যায় ঋগ্বেদের নাসদাসীয় সূক্তে (১০।১২৯)। পুরুষ সূক্তে (১০।৯০), হিরণ্যগর্ভ সূক্তে (১০।১২১), সৃষ্টি সূক্তে (১০।১৯০), তৈত্তিরীয় উপনিষদে (অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ (২।৭।১), ছান্দোগ্যে (সদেব সোম্য ইদমগ্রে আসীৎ - ২।৬।১), বৃহদারণ্যকে (আত্মৈবেদমগ্রে আসীৎ (১।৪।১) ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ (১।৪।১০) ইত্যাদি মন্ত্রের মধ্যে। মূল কথা — আদিতে 'এক' ছিলেন — অসৎ, সৎ, ব্রহ্ম, আত্মা — নানা নাম ও পরিচয় তাঁর। সেই 'এক' - এর ইচ্ছা হল বহু হবেন।

একা তো আনন্দ হয় না, তিনি দ্বিতীয় কামনা করলেন। দুই হলেন। (স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রেমে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ — বৃহ ১।৪।৩) জায়া ও পতি। কামনা করলেন সৃষ্টির জন্য বহু হবেন তিনি। (স অকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি। তৈত্তিরীয় ২।৬।৩)। তিনি আনন্দ স্বরূপ। কাজেই আনন্দ থেকেই উদ্ভব হয়েছে বিশ্বের, আনন্দেই বিশ্ব স্থিত এবং পরে আনন্দের মধ্যেই তার পর্যাবসান। (আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি-জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি ইতি — তৈত্তিরীয় ৩।৬।১)। ঋষিবর্গের অনুভবে, — জীবজগৎ সবকিছু ব্রহ্মের বিস্তার — ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ। আনন্দরস আস্বাদন — আত্মরস আস্বাদন-ই বিশ্বজগতের একমাত্র হেতু। ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও এই ভাবনার প্রতিধ্বনি শোনা যায় —

আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে
দিন রজনী কত অমৃত রস
উথলি যায় অনন্ত গগনে।

উপনিষদের এই আনন্দই বৈষ্ণব ভাবনায় কৃষ্ণারতিকে আশ্রয় করে বিচিত্র লীলারসে উচ্ছলিত।

(খ)

জড় ও জীবের মধ্যে মুখ্য পার্থক্য এই যে সাধারণ দৃষ্টিতে জড় নিষ্প্রাণ আর জীব প্রাণবান। 'সাধারণ দৃষ্টিতে' কথাটির তাৎপর্য এই যে — জড় নিষ্প্রাণ বস্তু নয়। আসলে তা অনভিব্যক্ত বা অব্যক্ত-প্রাণ সত্তা। জড়েরই বিবর্তনে বা বিকাশে প্রাণের উদ্ভব। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতেও যার মধ্যে প্রাণ-বীজ নেই, তার বিবর্তন-বিকাশে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব নয়। বৈদিক ঋষিও বলেছেন — 'প্রাণস্যেদং বশে সর্বং

যাহোক, প্রাণের জগত তথা প্রাণী জগত সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির নিয়মের অধীন। মনোবানে প্রাণী মানুষের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়েছে প্রাণ-বিশ্বের যুগ পরিবর্তন। তার পূর্ব পর্যন্ত স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় প্রাণী একই প্রাকৃতিক নিয়মের কঠোর বিধি অনুসরণ করে আবর্তিত হয়েছে গাছ, মাছ, গরু, ছাগল, কীটপতঙ্গ — হাজার হাজার বছর ধরে একই ভাবে — একই জৈবধর্মের অনুসরণ করে। কোন ক্ষেত্রেই মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনযাপনে নিজের কর্তৃত্ব ছিলনা, থাকে না, এখনও নাই। কিন্তু মন ও বুদ্ধির বিকাশের ফলে মানুষের মধ্যে উদ্ভব হয় চিন্তাশক্তির, আসে জিজ্ঞাসা আর সেই সূত্রে সৃষ্ট হয় দর্শন-বিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য, রাষ্ট্র, সমাজ। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ মনের মুখ্যতঃ তিনটি বৃত্তির কথা বলেন — ইচ্ছা, চিন্তা ও অনুভূতি। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মনের বৃত্তি সংকল্প বিকল্পাত্মক আর বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। প্রাণস্তরে পশু পাখী — সবই একান্তভাবে ইন্দ্রিয়ের — বিশেষ বিশেষ ভোগ্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষার উপর সম্পূর্ণ অধীন, বুদ্ধিজাত বিচার বিতর্ক সংযম, রুচির নির্ণয়াদি নিছক প্রাণ বা প্রাণীস্তরে অনুপস্থিত। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মন-বুদ্ধির এই দিকটির গুরুত্ব প্রধান। কঠোপনিষদে একটি সুন্দর রূপকে ও কাব্যময় ভাষায় মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির যে পরিচয় আছে — সেটি উল্লেখ করা যাক —

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তা ইত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥

(কঠোপনিষৎ ১।৩।৩-৪)

মূল কথা দেহরথের রথী আত্মা। বুদ্ধি সারথি মন হচ্ছে লাগাম — আর ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ভোগেচ্ছু ঘোড়ার মতো। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের রাশ ধরে মন আর মনরূপ সেই লাগামটি ধরে থাকে সারথি বুদ্ধি। রথকে তথা রথীকে নির্দিষ্ট ও উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালনা করে। মনোবান বুদ্ধিমান মানুষ — নিজের ইচ্ছা মতো, বিচার বিশ্লেষণ মতো যাবতীয় কর্ম করতে চায়, গড়তে চায়, হতে চায়। মানুষ প্রাণ-ভূমে প্রকৃতির

বিদ্রোহী সন্তান — অন্যান্য প্রাণীর মতো ব্যাকরণের পরিভাষায় মানুষ — কর্ম বা object নয়। কর্তা বা subject হতে চায়। এই চাওয়ার ফলেই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

(গ)

আদিম মানুষের মনে এই জিজ্ঞাসা

বা জানবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল কীভাবে এবং তার অন্তরে কী কী ভাবের উদয় হয়েছিল, সে দিকে নেত্রপাত করা যাক। মাতৃগর্ভের ঘনান্ধকার থেকে ভূমিষ্ঠ সদ্যোজাত মানবশিশু আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে — প্রাণ-ক্রিয়ার প্রথম বিস্ফোরণে জোরে কেঁদে ওঠে — ভয়ে ও বিস্ময়ে। যেন জানতে চায় এইসব কী — কিমিদম্ ? ভয় মিশ্রিত বিস্ময়ের ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় বস্তু তথা জগৎ জিজ্ঞাসা। তারপর মাতৃক্রোড়ে স্তন্যপানরত শিশু মায়ের মুখের দিকে আনন্দে তাকায় — জগৎ নয়, মানুষ দেখে যেন জানতে চায় — কে তুমি — কস্ত্বম্ ? প্রেম মিশ্রিত বিস্ময়। এখনকার নবজাতকের তথা সর্বকালের সকল নবজাতকের দৃষ্টি বা মানসিকতার আলোকে আদিম মানুষের জিজ্ঞাসার সূত্রটি যদি সন্ধান করা যায় তবে বিশ্বজগৎ ও বিশ্বমানবের সম্বন্ধে আদিম মানবের জিজ্ঞাসার একটা পথরেখা পাওয়া বোধহয় অসম্ভব নয়। আর এই জিজ্ঞাসার অনুচিন্তনে ও অনুভাবনায় কঠোর সাধনায় — বৈদিক পরিভাষায় কঠোর তপস্যার ফলে অধিগত হয়েছে — জড় ও প্রাকৃত বিজ্ঞানে বহু বিচিত্র সমৃদ্ধি, — রচিত হয়েছে মানুষের পরিবার - সমাজ, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি। এই বিসৃষ্টি ও আবিষ্কার নিঃসন্দেহে অতুলনীয় সম্পদ হলেও সবটা নয়, আরো একটি জিজ্ঞাসা মানব জীবনচর্যায় অপেক্ষিত ছিল সেটি আত্মদৃষ্টি বা অধ্যাত্ম দৃষ্টি। এটা জিজ্ঞাসার তৃতীয় তথা অন্ত্যস্তর।

মানুষ বহির্মুখী চোখে জগৎকে দেখেছে নিবিড়ভাবে এবং আরও গভীরভাবে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা সীমাহীন। এটিকে বলা যায় 'ইদম্', ভারতীয় ব্যাকরণের ভাষায় প্রথম এবং ইংরাজী ব্যাকরণের পরিভাষায় তৃতীয় পুরুষ। আমি-তুমি ছাড়া সবকিছু 'ইদম্'। তারপর দেখেছে মানুষকে — বিশ্বজগৎ ও নিজের মধ্যখানে স্থিত তোমাকে ব্যাকরণের মধ্যম-

পুরুষ বা Second Person 'তুম্' - কে। জগত দেখা তথা বস্তুবিজ্ঞান লাভ হয়েছে, মানুষ দেখা তথা সমাজ। মানব বিজ্ঞান বা সমাজ বিজ্ঞান লব্ধ হয়েছে — কিন্তু নিজেকে দেখা হয়নি। বিশ্বজিজ্ঞাসা এসেছে আত্মজিজ্ঞাসা আসেনি। কেন? কঠোপনিষদে আছে —এই প্রশ্নের চমৎকার উত্তর। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি সবই বহির্মুখ — তা দিয়ে জগৎ দেখা যায় — নিজেকে দেখা যায় না। কোন মানুষ উপনিষদের ভাষায় "আবৃত্ত চক্ষু" ধীর মানুষ চোখ ঘুরিয়ে যদি নিজের দিকে তাকাতে চায় এবং যদি পারেন — তবে নিজেকে চেনা যায়। এ যেন বিশ্বস্রষ্টার এক আশ্চর্য রসিকতা বা কৌতুক।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ (কঠ - ২।১।১)

পর্যায়টি এইরূপ — বিশ্ব বীক্ষা, মানব দৃষ্টি — শেষে আত্মদর্শন। কিমিদম্ — কস্ত্বম্ - তারপর 'কোঽহং" এই আধ্যাত্ম দৃষ্টি থেকে সৃষ্টি ধর্ম ও আধ্যাত্মভাবনা। ব্যাকরণের পরিভাষায় — উত্তম পুরুষ। পাশ্চাত্য ব্যাকরণের প্রথম পুরুষ। যাই হোক এই ত্রিমুখী জিজ্ঞাসা — বহির্জগৎ, মানবজীবন ও আত্মস্বরূপ এবং তা থেকে সমাহৃত জ্ঞান ও উপলব্ধি নিয়ে মানুষের মনুষ্যজীবনের — ব্যষ্টিগত ও সমষ্টি-গত উভয় দিক থেকেই সার্থকতা।

(ঘ)

বিশ্বের যাবতীয় জীবের মধ্যে মনোবলে বুদ্ধিমান মানুষই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ব কতগুলি জ্ঞান ও উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। পাঁচটি ইন্দ্রি-পথে — চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, রসনা মাধ্যমে, মানুষের বহির্জগতের জ্ঞান ও অনুভব হয় — দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, স্পর্শন ও আস্বাদন ক্রিয়া ঘটে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই যে বস্তুজগত, ব্যক্ত জগত, জৈব জগত — তা মানুষের ক্ষেত্রে বহিরঙ্গ জ্ঞান মাত্র। এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়

সংযুক্ত জ্ঞানের গভীরে মনোজগতে — জাগ্রত অবস্থায় ভাবনা কল্পনার মধ্যে এবং নিদ্রাকালে স্বপ্নরূপে রচিত হয় এক পরোক্ষ অবচেতন- মহাজগত। মন-বুদ্ধি-বোধির স্পন্দনে এখান থেকে, এই অন্তরঙ্গ সমুদ্রের তরঙ্গের দোলায়, জেগে ওঠে, ভেসে ওঠে মানুষের বিচিত্র জিজ্ঞাসাগুলি — আর তা প্রাপ্তির জন্য বহুমুখী সংগ্রাম ও সাধনার সংকল্প। রচিত হয় মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি।

দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-বোধি সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জীব এই সমষ্টি মানুষও আবার শক্তির তারতম্যে ও রুচির বিভিন্নতায় ব্যষ্টি কেন্দ্রে স্বতন্ত্র — ভিন্ন ভিন্ন সীমাবদ্ধতায় খণ্ডিত। কারো দৈহিক শক্তি সমধিক, প্রাণশক্তিতে কেউ বা প্রবলতর, আবার মন-বুদ্ধি শক্তির ঔজ্জ্বল্যে কেউ বা গরিষ্ঠ। ব্যষ্টির ও সমষ্টির মধ্যে যে শ্রেণী বিভাজন হয়, তার মূলে মুখ্যতঃ থাকে শক্তির প্রকার বৈচিত্র্য ও পরিমাণ প্রাচুর্য। এক এক গুণধর্মের প্রভূত সমাবেশের ফলে যে অতিশয়তার প্রকাশ হয়, তা থেকে কেউ হন বীর যোদ্ধা, কেউ হন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বৈষয়িক, কেউবা স্থিতিপ্রজ্ঞ ঋষি। কিন্তু পরিচিত মানুষের বা মনুষ্যদেহধারীর মধ্যে — তা যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন — সাধারণভাবে অতিশয় ভাবনার একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে তখন শক্তির বিরাট বিস্ফারণ ঘটে, তখন বুদ্ধির অগম্য, দুর্জ্ঞেয়, ভয়ংকর বিস্ময়কর আতিশয্যকে একটি অতি মানুষিক ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করি, সভয়ে নতমস্তক হই। পণ্ডিতগণ মনে করেন এটাই দেব-কল্পনার প্রসূতি সদন।

'দেব' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিরুক্তকার যাকে বলেছেন — "দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।" অর্থাৎ যিনি দান করেন বা দীপিত করেন, বা দ্যোতিত হন বা দ্যুলোকে বাস করেন — তিনি দেবতা। এই গুণগুলি আলাদা আলাদা করে ধরা যায়। আবার সাকল্যেও ধরা চলে। দেবতার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে মানুষ এবং তা পায়। দেবতার রূপ তখন দাতা। দেবতার রূপ সর্বদাই উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত। ঋগ্বেদের দেববর্গের শক্তি ও দীপ্তি বিচার করলে মনে হয় যে ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, বায়ু, অগ্নি প্রমুখ দেবগণ যেন প্রকৃতির এক একটি শক্তির ঘনীভূত বিগ্রহ। অবস্থান ভেদে দেবগণকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। অগ্নি, অপ্, পৃথিবী, সোম আদি ভূলোকের

দেবতা, সূর্য, মিত্র, বরুণ, দ্যু, পূষা, সবিতা, আদিত্য উষা প্রভৃতি দ্যুলোকের দেবতা। আর পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ লোকের দেবতা — ইন্দ্র, বায়ু, রুদ্র, মরুৎ, বিষ্ণু, পর্যন্য প্রভৃতি। এদের মধ্যে আবার তিন লোকের তিনজন মুখ্য দেবতা। যাস্কের ভাষায় — "তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ অগ্নিঃ পৃথিবী স্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বা অন্তরিক্ষ স্থানঃ সূর্যো দ্যুস্থানঃ।" অর্থাৎ পৃথিবীর প্রধান দেবতা অগ্নি অন্তরীক্ষের ইন্দ্র বা বায়ু আর আকাশের সূর্য।

বৈদিক দেবতাদের সংখ্যা কত? ঋগ্বেদে ৩৩টি দেবতার কথা আছে। "যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ"। (৮।২৮।১) অবশ্য এদের বাইরেও অনেক দেবতার কথা আছে ঋগ্বেদে। এমন কি দেবতাদের ঊর্ধ্ব সংখ্যা ঋগ্বেদেই উক্ত হয়েছে ৩৩৳১ জন। "ত্রীণি শতা ত্রিসহস্রণ্যগ্নির ত্রিংশচ্চদেবা নব চাসপর্যণ্। (১।৯।৯)। যদি এইভাবে বলা যায় যে মানুষের প্রার্থনা পূরণ করতে পারেন যে দিব্যশক্তি তিনি-ই দেবতা — তবে প্রয়োজন ভেদে মানুষের চাওয়ার যেমন শেষ নেই — তেমনি সংখ্যারও অন্ত থাকে না। দেবতা অসংখ্য।

পৌরাণিক যুগে দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তরকালে লৌকিক দেবতার সংযোজনে আরও সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। তার থেকেও বিস্ময়কর ঘটনা — যুগভেদে দেবতাদের মহিমা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে উন্নয়ন ও অবনয়ন। ঋগ্বেদের শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্র। পৌরাণিক যুগে স্বর্গের রাজা হয়েও উপেন্দ্র তথা বিষ্ণুর তুলনায় নিম্নস্থ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ছাড়া পৌরাণিক যুগে নারীদেবতার বিশেষতঃ শ্রীদুর্গা ও কালিকার গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তীকালে চণ্ডী, মনসা প্রমুখ দেবীও শক্তিদেবী মণ্ডলে বৃত হন। ধর্মঠাকুর ও অন্যান্য লৌকিক দেবতাও আছেন। অভারতীয় বীর্যের মধ্যে ইহুদী, খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্মেও জিব্রায়েল প্রমুখ দৈবীশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরের দূতগণকে দেবশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না কি?

(৩)

জীব মাত্রেই বেঁচে থাকতে চায়। জিজীবিষা প্রাণের সাধারণ ধর্ম। মানুষও জীব, কাজেই জিজীবিষু। কিন্তু আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন- এই মৌল প্রাণ বা পাশব বৃত্তিচতুষ্টয়ের মাধ্যমেই মানবজীবনের পূর্ণ সার্থকতা লাভ হয় — কোন স্থান ও কালের মানুষই মনে করে না। তবে মানুষের 'বাঁচা' বা সার্থক জীবন যাপন সম্বন্ধে অবশ্যই মতভেদ আছে। প্রথম তর্ক জীবন বলতে কি বুঝায় — তা নিয়ে। একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই কি জীবনের শেষ, না, দেহান্তে আরও কিছু অবশিষ্ট থাকে — আত্মারূপে - পরকালে ? ঐহিক ও পারত্রিকবাদীদের জীবন-ধারণার এই বৈপরীত্য ও বিতর্কটি অতি প্রাচীন। দেহাত্মবাদী চার্বাকপন্থীরা বলে — মরে গেলেই সব শেষ — আর কিছুই থাকে না মানুষের। যাকে চিতায় পুড়িয়ে ফেলা গেল, সে আবার আসবে কীভাবে। 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ' কিন্তু অধ্যাত্মবাদীরা বলেন যে দেহ পুড়ে যায় কিন্তু দেহী আত্মারূপে অবিনশ্বর। আত্মা — স্থূলদেহের মধ্যে অবস্থিত থাকে ও কর্মফল ভোগ করে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মীরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী। খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্মে জন্মান্তরের কথা নেই, আছে শেষ বিচারের দিনের কথা। যা হোক্ ধর্মবিশ্বাসী মাত্রেই আস্তিক। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে ইহ ও পরলোক — অর্থাৎ জীবন ঐহিক ও পারত্রিক দুই দিকেই প্রসারিত। তাদের কাছে পাপ পুণ্য, শুভ-অশুভ কার্যের রং আলাদা। জীবনের সার্থকতার মানও ভিন্নতর। সুখকে কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন ভোগ কর্মের মধ্যে — সম্পূর্ণ দেখে না কোন ধর্ম। কাজেই জীবনযাপনের লক্ষ্যগত ও পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকার জন্য, ধর্মে বিশ্বাসী আস্তিক মানুষের জিজীবিষার বা বাঁচবার এষণার রূপও আলাদা। তাঁরা কেবল ইহলোকের নয়, পরলোকের পক্ষেও যা কল্যাণকর ও সুখদ সেই কর্মে প্রবৃত্ত হন।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কে আশ্রয় করে যে বিশ্ববৈচিত্র্যের বিস্ময়কর প্রকাশ — তার মূলে আছে একটি শক্তি, যা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের জন্য দায়ী — তিনি ভগবান বা ঈশ্বর। জগতের যা কিছু আছে, ঘটছে ঘটবে সবই এক ঈশ্বরের ক্রীড়া বা

লীলা। দেবদেবীর মধ্যে সে এদেরই বিচিত্র বহু শক্তির প্রকাশ। দেবতারা দিতে পারেন, কাজেই তাঁদের কাছে প্রার্থনা করা যায়।

এই সচেতন দেবশক্তি ঈশ্বর শক্তি জ্ঞানে তার পূজা অর্চনা করা যায়। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তার কাছে প্রার্থনা, আবেদন নিবেদন করা যায়। স্তব ও স্তোত্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিপন্ন বা সম্পন্ন মানুষের হৃদয়ের আর্তি ও আকুতি পরিস্ফুট। আর এইজন্য তাকে সাহিত্য বলতে বাধা নেই। তাই স্তোত্র সাহিত্য অভিধাটি যে সার্থক, সুপ্রযুক্ত ও অর্থবহ তাতে সন্দেহ নেই।

(চ)

মনুষ্য সভ্যতার প্রারম্ভিক কাল থেকেই নৈসর্গিক শক্তির প্রকাশ ও বৈচিত্র্য কে বিস্ময়ে ভয়ে দর্শন করেছে মানুষ। দেবতা রূপে —প্রণাম করেছে, তার কাছে আবেদন নিবেদন করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসেছে শ্রদ্ধা ও প্রীতি — তা থেকে নৈকট্য ও অনুরাগ বেড়েছে। এই অনুরাগে — ঈশ্বরের প্রতি উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অনুরাগের নাম-ই ভক্তি। "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" কাজেই দেবতারূপী ঈশ্বরের প্রতি যে অনুরাগ তাই ভক্তিরূপে প্রকাশ পেয়েছে পূজার্চনায়, বন্দনায়-প্রণামে স্তবে স্তোত্রে বিচিত্র ও বিপুলভাবে। বৈদিক সাহিত্যের সংহিতা অংশ — সূক্তসমূহ — মূলতঃ স্তোত্র। অর্থাৎ বিভিন্ন দেবতার কাছে মানুষের আর্ত আবেদন ও প্রার্থনা।

পরবর্তীকালে পুরাণ ও তন্ত্রসাহিত্যের মধ্যেও এই স্তব-স্তুতির ধারা অব্যাহত গতিতে ভক্তির গাঢ় রসে রঞ্জিত হয়ে আরও নিগূঢ় ভাবে প্রবাহিত। ভক্তি-বাদী আচার্যগণের রচনার কথা বাদ দিয়েও অদ্বৈতবাদী শ্রীশংকরাচার্যের রচনার মধ্যে সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যের যে বিস্তার ঘটেছে তা বিস্ময়কর। রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যে এবং বিভিন্ন পুরাণে স্তোত্র সাহিত্যের যে সরল, বলিষ্ঠ, হৃদয়গ্রাহী বিস্তার-ভক্তিরসের মাধুর্যে, কাব্যসৌন্দর্যের বৈচিত্র্যে তার আস্বাদন অভিনব ও মহিমময়।

(ছ)

স্থান ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যষ্টি মানুষের ও সমষ্টি মানুষের তথা সামাজিক মানুষের যে পরিবর্তন ঘটে — সেটা মুখ্যতঃ ভোগ্য উপকরণ বাহুল্য বৈচিত্র্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ বহিরঙ্গ রূপান্তর। মানুষের অন্তরঙ্গ এষণা জিজীবিষা - সুন্দর জীবন যাপনের মৌল আকুতি তা অপরিবর্তনীয়। কাজেই কালপ্রবাহের মধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যেও মূল এষণা কাজ করে চলে — স্থান কালের পরিবর্তন, ভাব-ভাষার রূপান্তর বাহ্যিক ব্যাপার মাত্র। কাজেই — ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বাহিরে যে অচেনা-অজানা শক্তি — দৈবশক্তি ঐশীশক্তি যে নামই দেই না কেন ভয়ে বা প্রীতি বশে তার প্রতি একটা সহজ নির্ভরতা বোধ জাগে। আসে আকুতি, প্রার্থনা — আর তা ভাষায় স্তোত্র হয়ে ফুটে ওঠে। ভক্তিবাদে ভয়ের স্থান আছে ঐশ্বর্যের দিকে। আবার সৌন্দর্যের দিকে থাকে প্রীতি। কাজেই যুগের ভাষা-ভঙ্গী, রীতি-নীতিকে আশ্রয় করে, চিরন্তন বা শাশ্বত মানব মন, আস্তিক্য বুদ্ধিদ্বারা উদ্দীপিত মন ভক্তি ভাবে ও রসে আপ্লুত হয়ে যায় অতি সহজেই এবং তার ফলে উৎসের সঙ্গে — উত্তর-প্রবাহের একাত্মতা রচিত হয়। এই অনুষঙ্গে সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যের ধারার সঙ্গে বাংলা ভক্তি-সাহিত্যের ভক্তি-গীতি ও কাব্যের সংযোগ সূত্রটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বলে মনে করার যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে। আমরা আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে যুক্তি প্রমাণ যোগে এটাই উপস্থাপিত করার প্রয়াস নিয়েছি।

(জ)

আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণা নিবন্ধের শীর্ষক —'সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও বাংলা ভক্তি-গীতি কাব্যসাহিত্যের সম্পর্ক সূত্র — একটি সমীক্ষা।' আলোচনাক্রম এই প্রকার —

প্রথম অধ্যায় — স্তোত্র সাহিত্যের ভূমিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায় — স্তোত্র সাহিত্যের পরিচয় বৈচিত্র্য, শ্রেণী বিন্যাসাদি।

তৃতীয় অধ্যায় — সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও বাংলাসাহিত্যের আদি-মধ্য যুগ ।

চতুর্থ অধ্যায় — সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও ঊনবিংশ শতকের ভক্তি-গীতি কাব্য ।

পঞ্চম অধ্যায় — উপসংহার ।

পরিশিষ্ট — ক) স্তোত্র সাহিত্য ও ভক্তি-গীতি কাব্যের কিছু নির্বাচিত সংকলন ।

খ) গ্রন্থপঞ্জী ।

বস্তুত: দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই স্তোত্র সাহিত্যের সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ, পরিচয়াদি দিয়ে মূল আলোচনার প্রত্যক্ষ সূত্রপাত করা হয়েছে । এই অংশে সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যের পরিচয় প্রসঙ্গে বেদপুরাণাদি ও আচার্যগণের স্তোত্রাদির আলোচনা ও উদাহরণাদি দেওয়া হবে । তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে মুখ্যত: বাংলা সাহিত্যের ধারায় স্তোত্র সাহিত্যের যে বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে তার সোদাহরণ বিচার বিশ্লেষণ আছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্তোত্র সাহিত্যের বৈচিত্র্য

শ্রেণী বিন্যাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্তোত্র সাহিত্যের শ্রেণীবিন্যাস ও বৈচিত্র্য

স্তোত্র শব্দটি পারিভাষিক ও প্রাচীন ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধে এই ঋক্-টি পাওয়া যায় —

স্তোত্রমিন্দ্রায় গায়ত পুরুনৃম্ণায় সত্বনে ।
নকির্যং বৃণ্বতে যুধি ॥ (৮।৪৫।২১)

— বহু ধনশালী দানশীল ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর । যুদ্ধে কেউ তাঁকে হারাতে পারে না । স্তোত্র হচ্ছে কোন দেবতা বা উচ্চতর শক্তির গুণ-মহিমাদি কীর্তন । শব্দটির ব্যুৎপত্তি হয়েছে রতি ও প্রশংসার্থক 'স্তু' - ধাতু থেকে । (স্তু + ত্র - ভাবে) স্তব, স্তুতি, নুতি সমপর্যায়ের শব্দ । "স্তবস্তোত্র স্তুতি নুতি ইত্যমরঃ। (স্বর্গবর্গ-১৬১) । প্রশস্তি শব্দটি-ও সমার্থক । তবে সাধারণতঃ মানুষের ক্ষেত্রেই প্রশস্তি শব্দটি ব্যবহৃত হয় ।

রূপগত দিক থেকে স্তোত্রকে বলা যায় খণ্ডকাব্য । এক বা একাধিক শ্লোকে রচিত হতে পারে স্তোত্র । খণ্ডকাব্যের ধারায় পঞ্চক, অষ্টকাদি নামে-ও স্তোত্রের নামকরণ হতে পারে । স্তোত্র কাব্যের-ও অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে ছন্দোবদ্ধ গীতময়তা । গদ্যে রচিত প্রশস্তিমূলক কাব্যের প্রাচীন নাম শস্ত্র —

অপ্রগীত মন্ত্রসাধ্য গুণিনিষ্ঠ গুণাভিধানং শস্ত্রম্ ।
প্রগীত মন্ত্রসাধ্য গুণিনিষ্ঠ গুণাভিধানং স্তোত্রম্ ॥

সুতরাং স্তোত্রের মধ্যে কেবল ছন্দের দোলা নয়, সুরবৈচিত্র্য, গীতময়তাদি-ও প্রত্যাশিত। বৈদিক সাহিত্যে ঋক্ সংহিতার সূক্তগুলি যখন বিশেষ সুরে গীত হয়, তখন সামবেদের অন্তর্ভুক্ত তার তার আবেদন-ও হয় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ।

শ্রেণী বিভাগ

সংস্কৃত স্তোত্র চতুর্বিধ —

দ্রব্যস্তোত্রং কর্মস্তোত্রং বিধিস্তোত্রং তথৈব চ ।
তথৈবাভিজন স্তোত্রং স্তোত্রমেতচ্চতুষ্টয়ম্ ॥
(মৎস্যপুরাণ, ১৫১ অঃ)

দ্রব্যস্তোত্র, কর্মস্তোত্র, বিধিস্তোত্র আর অভিজন স্তোত্র — এই চার প্রকার ভেদ স্তোত্র সাহিত্যের নাম থেকেই সাধারণভাবে তার বিষয়গুলির পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য অনুমিত হয় ।

কোন দ্রব্য বা বস্তুর কোন তীর্থস্থান, তিথি, নদী, পর্বত, বন প্রভৃতির গুণাদি বর্ণিত হয় যে স্তোত্রে তা দ্রব্যস্তোত্র । হরিদ্বার, বারানসী, বৃন্দাবন প্রমুখ তীর্থস্থান, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র গোদাবরী প্রমুখ নদীর মহিমা, কেদার-বদরী-অমরনাথ প্রমুখ পর্বত, গঙ্গাসাগরাদি তীর্থে পৌষ সংক্রান্তিতে স্নান, বিভিন্ন পুণ্যতিথিতে স্নানাদির বিশেষ মহিমা কীর্তনাদি তুলসী, বিল্ববৃক্ষের মহিমা — এগুলিও দ্রব্য স্তোত্রের মধ্যে ধরা চলে ।

কর্মস্তোত্রের বাচ্য হচ্ছে কোন বিশেষ কর্মের বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্তন । কোন যজ্ঞানুষ্ঠান বা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য — যেমন রোগমুক্তির জন্য লক্ষ মন্ত্র জপের ব্যবস্থা বা বিশেষ পূজা বা যজ্ঞের । স্থান-কাল বিশেষে স্বর্ণ, গোধনাদি দানের মহিমা কীর্তনাদি ।

বিধিস্তোত্র — কোন বিশেষ কর্মের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির অধিকার মধ্যে কর্মটি নিষ্পন্ন হলে ফলপ্রাপ্তি বিশেষ মহিমার ঘোষণা ।

আর অভিজন স্তোত্র হচ্ছে দেবতা বা দেবোপম কোন ব্যক্তির মহিমা কীর্তন । স্তোত্র বলতে অভিজন স্তোত্রকেই সাধারণভাবে বুঝায় । আর বিপুল স্তোত্র-সাহিত্যের ৯৯ শতাংশ বা ততোধিক অংশই অভিজন স্তোত্র । সুতরাং মুখ্যতঃ অভিজন স্তোত্রের প্রাধান্য সুস্পষ্ট ।

স্তোত্র ও কবচ

স্তব কবচ শব্দটি একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। স্তব-স্তুতির মতো স্তব-কবচ-ও একটি অতি পরিচিত শব্দদ্বৈত। সংস্কৃত স্তব সংকলনের গ্রন্থগুলিতে প্রায় সর্বত্র-ই কবচের-ও সংগ্রহ থাকে। গ্রন্থনামাতে-ও থাকে এই স্বীকৃতি স্তব-কবচমালা ইত্যাদি। কবচ শব্দটির অর্থ বর্ম — দুর্ভেদ্য আচ্ছাদন যা বাহির উৎক্ষিপ্ত যে কোনো অস্ত্র প্রহারকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ। "কং-দেহং বঞ্চতি বিপক্ষাস্ত্রানি রক্ষয়িত্বা রক্ষতীতি।" মহাভারতে আছে কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের কথা। কবচাচ্ছাদন থাকায় দরুণ কর্ণের দেহ অস্ত্রবিদ্ধ হোতো না। তাই অর্জুনের দেবপিতা ইন্দ্রদেব — ভিক্ষার ছলে কর্ণের কবচকুণ্ডল হরণ করে, অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে কর্ণকে আহত হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

যাহোক শাস্ত্রে আছে — মন্ত্রাদি দ্বারা-ও কবচ নির্মাণ করা যায়। রক্ষক-রূপী উদ্দিষ্ট দেবতা বিশেষের যথাবিধি পূজার্চনা করে ভূর্জপত্রে রক্ষামন্ত্রাদি লিখে, কোন বিশেষ দ্রব্যসহ বা অমনি তাম্র বা লৌহ বা রজত আধারে অর্থাৎ মাদুলীতে তা ঢুকিয়ে দিয়ে গলায় বা ডান হাতে বেঁধে দেওয়া হয়। এই একই উদ্দেশ্যে মাদুলী ধারণ সহ বা আলাদা করে রক্ষক দেবতা বিশেষের যে স্তব করা হয় — সেই স্তবের পারিভাষিক নাম কবচ। মুখ্যতঃ তন্ত্রগ্রন্থেই কবচাদি সুলভ। কোন কোন পুরাণে-ও পাওয়া যায়। গ্রন্থনা ও আঙ্গিকের দিক থেকে কবচ ও স্তোত্রের মধ্যে পার্থক্য নেই। তবে কবচে মন্ত্রবীজাদির সংযোজন থাকে। ভাষার পার্থক্য থাকে। কবচের ভাষা সাদামাটা। কিন্তু স্তোত্রের ভাষা বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক বা আচার্যদের কৃত — যেমনই হোক না কেন — সর্বত্র, গীতিময়তা, ছন্দ-অলংকারের সৌন্দর্য ও কাব্যমাধুর্য মণ্ডিত। স্তোত্রের মধ্যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রস থাকে। কবচের উদ্দেশ্য রক্ষা পাওয়া, তাই 'রক্ষতু' ইত্যাদি শব্দের প্রাচুর্য থাকে এবং দেবতা বিশেষের বীজমন্ত্রাদির প্রয়োগ থাকে। স্তোত্রের মধ্যে — দেবতার প্রীতি ও সন্তোষ বিধান-ই মুখ্য — প্রার্থনা গৌণ। আর কবচের মধ্যে রক্ষণ বা আপদুদ্ধারণ-ই একমাত্র কাম্য। বীজমন্ত্রাদি সহ কবচ-মন্ত্রকে একবারে রক্ষা-আকুতি সর্বস্ব বলা যায়। খুব পরিচিত শনিঠাকুর বা

শনৈশ্চর দেবতা বা গ্রহের স্তব ও কবচ দুটি উল্লেখ করে পার্থক্যটি বিচার করা যাক।

বিশেষ পূজাদির সংকল্প বাক্যাদি নিত্যক্রিয়ায় আবশ্যক হয় না বটে কিন্তু নিত্যকার স্তব বা কবচাদির ক্ষেত্রেও প্রারম্ভিক পাঠ থাকে। যেমন, শনি-স্তবের প্রারম্ভিক পাঠ এইরকম —

ক) "অস্য শ্রীশনৈশ্চর স্তোত্রস্য দশরথ ঋষিঃ
শনৈশ্চরো দেবতা ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ শ্রীশনৈশ্চর প্রীত্যর্থং
জপে বিনিযোগঃ।

দশরথ উবাচ

কোণান্তকো রৌদ্র যমোঽথ বভ্রুঃ
কৃষ্ণঃ শনিঃ পিঙ্গল মন্দ সৌরি।
নিত্যংস্মৃতো যো হরতে চ পীড়াং
তস্মৈ নমঃ শ্রীরবিনন্দনায় ॥' ইত্যাদি

আর কবচের প্রারম্ভিক পাঠ —

খ) অস্য শ্রীশনৈশ্চর কবচস্য গৌতম ঋষি বিরাট ছন্দঃ
শনৈশ্চরো দেবতা আপদুদ্ধরণে বিনিযোগঃ

ওঁকারো মে শিরঃ পাতু
ঐংকারঃ কণ্ঠদেশকে।
হ্রীং মে হৃদি সদা পাতু
শ্রীং মে পাতু সদা মুখম্ ॥ ইত্যাদি

তারপর — ইতি ব্রহ্মযামলে বেদীশ্বর সংবাদে শনেঃ কবচং সমাপ্তম্।"

আবার কোন কোন স্তবের সঙ্গে কবচ অংশও সন্নিবিষ্ট থাকে। একই সঙ্গে স্তব ও কবচ হয়। বহুল প্রচারিত ও অতি পরিচিত আদ্যাস্তবটি উল্লেখযোগ্য। কুড়িটি শ্লোকে সম্পূর্ণ আদ্যা স্তোত্রটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে — পাঠ ফল বা

120847
- 3 JUL 1998
North Bengal University
Library
Raja Rammohanpur

ফলশ্রুতিটি সাধারণত যা স্তবের শেষে দেওয়া হয়, 'আদ্যাস্তোত্রে'— তা দেওয়া হয়েছে প্রারম্ভিক সাড়ে চারটি শ্লোকে । অবশ্য স্তোত্রাংশ শেষে-ও ১৫ সংখ্যক শ্লোকের শেষ চরণ ও ১৬ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম চরণে ফলশ্রুতির অনুরণন শোনা যায় । যাহোক্ মূল স্তোত্রটি আরম্ভ হয়েছে পঞ্চম শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ থেকে —

"ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা" — ইত্যাদি থেকে পঞ্চদশ শ্লোকের প্রথম চরণ পর্যন্ত

বিষ্ণুভক্তি প্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা ।

তারপর ১৭ থেকে ২০ শ্লোক পর্যন্ত আদ্যা কবচ —

"জয়া মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ"(১৭) ইত্যাদি থেকে — "ভয়ংকরী মহারৌদ্রী মহাভয়বিনাশিনী ।" (২০) পর্যন্ত — ইতি ব্রহ্মযামলে ব্রহ্ম নারদ সংবাদে আদ্যাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।।" এখানে ভাষা বা রীতিতে স্তোত্র ও কবচের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই । পার্থক্য কেবল রক্ষায় অভিমুখিতার প্রাধান্য ।

দ্রব্য — কর্ম ও বিধি স্তোত্র

সংস্কৃতে রচিত বিপুল স্তোত্র সাহিত্য-মহাসমুদ্রের পাশে দ্রব্য-কর্ম-বিধি স্তোত্র তিনটির সাকল্যে অধিষ্ঠান গোষ্পদ বা ততোধিক সংকীর্ণ বিন্দুবৎ । আবার তিনটিকে, বিশেষ করে কর্ম ও বিধিকে সর্বদা আলাদা করা-ও যায় না । কর্মের প্রেরণা ও শাস্ত্রীয় বিধান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিপূরক ।

দ্রব্য বা বস্তু বিশেষের নদী, পর্বত, তীর্থ, তিথি, গাছ-লতা, মহিমা বা মাহাত্ম্য বর্ণনার নাম দ্রব্যস্তোত্র । কেবল বর্ণনা নয়, মাহাত্ম্য প্রকাশ । বর্ণনা খানিকটা থাকতে পারে কিন্তু মুখ্য বাচ্য তার মাহাত্ম্য কীর্তন । বৈদিক সাহিত্য থেকে পুরাণ, তন্ত্র ও আচার্যগণের রচনায়-ও ঐ শ্রেণীর বহু স্তোত্র আছে । এই পর্যায়ে আচার্য শংকর রচিত কাশী স্তোত্র, মণিকর্ণিকা স্তোত্রাদি সমৃদ্ধ কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত ।

যথা — মণিকর্ণিকা স্তোত্রের একটি স্তবক —

তৎ তীরে মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সাযুজ্য মুক্তিপ্রদৌ
বাদং তৌ কুরুতঃ পরস্পরমুভৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে ।
মদ্রূপো মনুজোঽস্তু হরিণা প্রোক্তঃ শিবো তৎক্ষণাৎ
তন্মধ্যাদ্ ভৃগুলাঞ্ছনো গরুড়গঃ পীতাম্বরো নির্গতঃ ॥

তন্ত্র-পুরাণে— তুলসী গাছ, বিল্ববৃক্ষ, রুদ্রাক্ষ বিজয়া (সিদ্ধি) ইত্যাদির মহিমাত্মক স্তোত্রগুলি দ্রব্যস্তোত্র শ্রেণীভুক্ত । এখানে দুটি উদাহরণ দেওয়া গেল । একটি মৎস্য সূক্তের ষোড়শ পটলে — পঞ্চশ্লোকাত্মক তুলসী স্তোত্রের প্রারম্ভ শ্লোক —

ঈশ্বর উবাচ

ইন্দ্রাদ্যৈঃ সকলৈর্দেবৈরর্চিতা সুর সুন্দরীম্ ।
ভক্তানাং বরদাং বন্দে তুলসী সৌম্য রূপিণীম্ ॥ ইত্যাদি

সময়াচার তন্ত্রে প্রথম পটলে বিজয়া (সিদ্ধি)ও স্তবটি আধুনিক মনের কাছে কৌতুকাবহ । সপ্তশ্লোকে সম্পূর্ণ বিজয়া স্তোত্রের প্রথম শ্লোকটি এই —

ওঁ আনন্দদায়িনীং বন্দে সদানন্দ পদদ্বয়ে ।
আনন্দ কন্দলীং বন্দে সুচ্ছন্দ বোধরূপিণীম্ ॥ ইত্যাদি

বৈদিক সাহিত্যের মধুমতী সূক্ত "ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে" (ঋগ্বেদ ১।৯০।৬-৯) ইত্যাদিকে শ্রেণীবিচারে দ্রব্যস্তোত্র শ্রেণীভুক্ত করায় কোন বাধা আছে কি ? তেমনি কর্ম ও বিধি স্তোত্র রূপে বৈদিক শান্তি বচন, স্বস্তিবাচনাদির কথা মনে করা খুব অযৌক্তিক মনে হয় না বোধ হয় ।

যাহোক — বাংলা ভাষায় এই ধারার অনুসরণ ক্ষীণ । তীর্থমঙ্গলাদি গ্রন্থে তীর্থমহিমার বর্ণনা আছে । মঙ্গলকাব্যেও দেখা যায় । তুলসী মহিমাদি মেয়েদের ব্রতকথায় — এবং সিদ্ধিগঞ্জিকাদির বিবরণ লোকসাহিত্যে কিছু কিছু দেখা যায় ।

অভিজন স্তোত্র

বিপুল সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যের অতি অতি ক্ষীণ কিছু ভগ্নাংশ বাদ দিলে সবটাই অভিজন স্তোত্র। সেগুলির মধ্যে আবার দেবতাদের স্তোত্র-ই সর্বাধিক। প্রাগৈতিহাসিক বা বহু প্রাচীন কালের আদিম, অশিক্ষিত, সরল মানুষথেকে সুরু করে সাম্প্রতিক কালের নবীন, শিক্ষিত, সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পর্যন্ত একটি সহজ সাধারণ বিশ্বাস এই যে এই বিশাল বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, একান্ত নিরর্থক-ও নয়। এই সদাচঞ্চল পরিবর্তনশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে আছে একটি সচেতন সত্তায় বিস্ময়কর নিত্যস্থিতি ও অবিচ্ছিন্ন বিকাশ বা অভিব্যক্তি। কেবল বহিরঙ্গ কার্য বা ফুল-ফল নয় অন্তরঙ্গ কারণ — মূল পর্যন্ত তার বিস্তার। কী সেটা এটাই প্রশ্ন করে মানুষ এবং তার পরিচয় পেতে চায়। এই বহুব্যাপ্ত অন্বেষার পথ ধরে মানুষ সৃষ্টি করেছে ধর্ম - দর্শন - বিজ্ঞান - সমাজ - শিল্প সাহিত্য — মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। একটি সর্বাত্মক আদ্যন্ত অখণ্ড চৈতন্যশক্তি — নানা রূপে ও নামে, সবকিছুর অন্তর বাহির পরিব্যাপ্ত বিবর্তিত, বিকশিত হয়ে উঠেছে ও উঠছে — এই প্রত্যয়যুক্ত ভাবনা, চিন্তা — ধ্যানধারণা, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মাধ্যমেই ঘটেছিল প্রথম এই আস্বাদন। নিষ্প্রাণ অচেতন জড়ের গভীরেও যে বিরাজ করছে সুপ্ত প্রাণশক্তি অস্ফুট চেতনা — তা এখন আর ধর্মীয় কুসংস্কার বা দার্শনিক কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত। বহুরূপী ও অনন্ত নামা এই সচেতন শক্তিটি বিভিন্ন স্থানে কালে — ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান্, কৃষ্ণ, কালী, শিব, গড্, আল্লা নানা নামে ব্যাখ্যাত হয়েছে, আরাধ্য ও স্তবনীয় হয়েছে। এই নানা রূপের সাধারণ নাম দেবতা।

দেব শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থনিরূপণে নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক বলেছেন — "দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।" (নিরুক্ত - ৭।১৫)। দান করেন যিনি, যিনি উজ্জ্বল, দ্যুতিময় বা স্বর্গে বাস করেন তিনি দেবতা। আবার দিব্ ধাতুর একটি অর্থ আছে ক্রীড়া। যিনি খেলেন, খেলান বা খেলতে ভালবাসেন তিনি দেবতা। দীপন বা উজ্জ্বলতা বহিরঙ্গ রূপ, দ্যোতনার মধ্যে

সামান্য অন্তরঙ্গ ভাবের পরিচয় আছে। যেমন আছে ক্রীড়াশীলতার মধ্যে। দ্যুস্থান অর্থাৎ স্বর্গের বাসিন্দা আর্যদেবতার পরিচয় গুণ কর্মগত নয়। দান — অর্থাৎ তিনি দিতে পারেন, প্রার্থনা করলে তার কাছ থেকে অভিলক্ষিত বস্তু পাওয়া যায়, খেলার ছলে বা লীলাচ্ছলেও দিতে পারেন তিনি — বোধহয় এই ব্যাখ্যাটি স্তুতিকারী প্রার্থী মানুষের কাছে দেব-শব্দের মুখ্য ব্যঞ্জনা। স্তোত্র সাহিত্যের মূল কাঠামোটাকেই প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন সর্বস্ব বললেও খুব অত্যুক্তি হয় না।

স্তোত্র আছে সংস্কৃত সাহিত্যের বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে এবং সিদ্ধ সাধক-বর্গের ও ধর্মাচার্যদের রচনায়। ঋগ্বেদের প্রায় পনর আনাই স্তোত্র মুখ্যতঃ অভিজন স্তোত্র। ঋগ্বেদের দেবতাদের স্থানানুসারে তিনটি বিভাগ — পৃথিবী স্থান দেবতা, অন্তরীক্ষ স্থান দেবতা এবং দ্যুস্থানের দেবতা। পৃথিবী স্থানের দেবতা — অগ্নি, পৃথিবী, অপ্, সোম। অন্তরীক্ষ স্থানের মুখ্য দেবতা — ইন্দ্র, রুদ্র, পর্জন্য। আর দ্যুস্থানের সূর্য, সবিতা, বিষ্ণু, মিত্র, পূষা, বরুণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, উষা যম, বৃহস্পতি প্রমুখ।

বৈদিক দেবতাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন — প্রস্তুত অভি-সন্দর্ভের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তাঁদের স্তবণীয় রূপটির অর্থাৎ প্রার্থনা পূরণকারী রূপটিই মুখ্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তিকেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকাশ অনুসারে যে যে দিব্য রূপসমূহ মূর্ত হয় — যেমন, অগ্নি, সূর্য, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝা-ঝটিকা — বিশেষ বিশেষ রূপ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে ওঠে — তারা এক এক জন দেবতা। স্থূল দৃষ্টিতে এইগুলি প্রাকৃতিক শক্তি বা জড়শক্তি। কিন্তু ভয়ে, বিস্ময়ে — তথা জীবনের প্রয়োজনে এই প্রাকৃতিক জড়শক্তিগুলিকেই দেবতা বলে ভাবে ও আবেদন নিবেদন করে মানুষ। কেন করে? কারণ আদিম তথা মৌল অন্ধ বিশ্বাস — যা পরে দার্শনিক প্রত্যয়ে সুস্থিত হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই চৈতন্যময়। সবই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ। কঠোপনিষদের ঘোষণা — যদিদং কিঞ্চ জগৎসর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ॥ (২।৩।২)

সাধারণভাবে বেদের তথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ত্রিমুখী — আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। জড় শক্তি রূপে বিচারের যে দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ তা আধিভৌতিক। জড় তথা পঞ্চ মহাভূতের অন্তরে স্থিত দেব-শক্তিতে আস্থা রেখে যে বিচার ও পর্যালোচনা, তা আধিদৈবিক। আর — 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে ভাণ্ডে' — এই লোকসূক্তিতে আভাসিত বিশ্বের যাবতীয় শক্তির স্থিতি আছে আত্মার মধ্যে ব্যষ্টির আধারে সমষ্টির আস্বাদন — তার নাম আধ্যাত্মিক দৃষ্টি। যাহোক, স্তোত্রাদির বিশেষ করে বৈদিক দেবতাদির স্তোত্রে আধিদৈবিক দৃষ্টির প্রসারণ। আর এই প্রত্যয়েই প্রার্থনা স্তোত্রসমূহ সুস্থিত।

কেবল বৈদিক সূক্তে নয়, পৌরাণিক তান্ত্রিক, লৌকিক সব স্তোত্রের মূলেই এই মানসিকতা বিদ্যমান। বস্তুর বা মূর্তির অন্তরে বা অন্তরালে দেবতার স্থিতি উপস্থিতি কল্পিত ও প্রত্যয়ে সুস্থিত না হলে স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হবে কার উদ্দেশে। কার কাছে হবে আবেদন-নিবেদন প্রার্থনা? সুতরাং একথা বলার মধ্যে কোন অত্যুক্তি হবে না মনে করি। যদি বলা হয় — যে স্তোত্র সাহিত্য কেবল আধিদৈবিক দৃষ্টি-প্রধান নয় — একেবারে আধিদৈবিক দৃষ্টিসর্বস্ব।

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ঋগ্বেদে মুখ্যতঃ ইন্দ্রদেবতার প্রাধান্য সর্বাধিক। ঋগ্বেদের সূক্তিগুলির প্রায় এক-চতুর্থাংশ-ই ইন্দ্রপ্রশস্তি। কিন্তু পরে বৈদিক ভাবনার বিবর্তনে — বিশেষতঃ পৌরাণিক দেববাহে ইন্দ্রের স্থানটি গ্রহণ করেছেন উপেন্দ্র বা বিষ্ণু। এই একই ভাবে বিভিন্ন ভাবনায় পুরাণে, তন্ত্রাদিতে প্রাধান্য শিব ও শক্তিদেবতা সমূহ। এই পরিণাম প্রাপ্তির মূলে ক্রমশঃ ভয় ভীতি থেকে প্রীতি-ভক্তির বিকাশ ঘটেছে এবং তা উত্তরকালের স্তব-স্তুতির মধ্যে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

পঞ্চোপাসক — বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য — এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে, শেষের দুটির — সূর্য উপাসক সৌর ও গণেশ উপাসক গাণপত্য — যথাক্রমে বৈষ্ণব ও শৈব ধারার সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে। পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রের মধ্যেও এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যেমন বিষ্ণুর ধ্যানমন্ত্র — "ধ্যেয় সদা

সবিতৃমন্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণঃ" ইত্যাদি । প্রচলিত সূর্যনারায়ণ শব্দটি-ও লক্ষণীয়। আর পৌরাণিক বিবরণে গণেশ হচ্ছে, শিব ও শক্তির সন্তান ।

এই একই ধারায় অপ্রধান দেবতা অর্থাৎ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, মনসা, শীতলা প্রমুখ দেবতার উদ্ভব হয়েছে । শক্তিদেবতার নানা ভেদ – দশমহাবিদ্যা প্রমুখ দেবী-কল্পনা । তারপর এই ধারায়-ই – বাশুলী, ষষ্ঠী, সুবচনী, বিপত্তারিণী, ধর্মরাজ, মদনকাম, শনিঠাকুর, সত্যনারায়ণ, ওলাবিবি, বনবিবি, দক্ষিণরায়, কালুরায় প্রমুখ লৌকিক দেবতার আবির্ভাব । কেবল পুরাণতন্ত্র নয়, ব্রতকথাদির মধ্যে-ও স্তবস্তুতি দুর্লভ নয় । আর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে – সাধক ভক্ত ও আচার্যগণ-ও সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন বিপুল ভাবে ।

সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যের বিপুল বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা গেল । উল্লেখযোগ্য যে দ্রব্য-বিধি-কর্ম স্তোত্রাদির পরিধি অভিজন ধারার তুলনায় অতি সংকীর্ণ হলে-ও সাধারণভাবে বৈদিক-তান্ত্রিক-পৌরাণিক সাহিত্যে এমন কি আচার্যগণ রচিত স্তোত্র সাহিত্যে-ও ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্ন । তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে মুখ্য ধারা অভিজন স্তোত্রের মধ্যে প্রবাহিত । আবার প্রকারে সংখ্যায় ও সাহিত্যিক শিল্পগুণে ও মাধুর্যে একচ্ছত্র গৌরবের অধিকারী এই শাখাটি । বৈদিক সাহিত্যে সংহিতা ভাগে ইন্দ্রাদি দেবতার স্তোত্র সংখ্যায় সমধিক । কিন্তু বৈদিক ভাষা ক্রমশ দুরূহ হওয়ায় লৌকিক সংস্কৃতে রচিত পুরাণতন্ত্রাদিতে উল্লিখিত স্তোত্রাবলীর প্রভাব – তথা আবেদন বাংলা ভাষা প্রমুখ নব্য ভারতীয় আর্যভাষাতে রচিত সাহিত্যে যেমন সরাসরি পড়েছে – বৈদিক ভাষায় উত্তরাধিকার তেমনভাবে বোধহয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি । লৌকিক সংস্কৃতে রচিত কবিগণের ও আচার্যগণের স্তোত্র সাহিত্যের মাধুর্য ও আস্বাদন – বিশেষতঃ ভক্তি সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে ।

তবে বৈদিক সাহিত্যের প্রার্থনা মন্ত্রগুলি বিশেষতঃ শান্তিবচন, স্বস্তিবাচন, সংজ্ঞান সূক্ত, মধুমতী সূক্ত ইত্যাদি এখনো সঙ্গীত রূপে— মুখ্যতঃ প্রাতিষ্ঠানিক

মঙ্গলাচরণ সূক্ত-রূপে সগৌরবে সুস্থিত। তাছাড়া, বিশ্বদেব সূক্তম্, পুরুষ সূক্ত হিরণ্যগর্ভ সূক্ত, সৃষ্টিসূক্ত, দেবীসূক্ত প্রমুখ স্তোত্রগুলির প্রভাব কিছুটা গৌণ-ভাবে হলে-ও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের উদার ভিত্তিভূমি রূপে — উত্তমর্ণরূপে — তার গৌরবময় অধিষ্ঠান — ঐতিহাসিক সত্যরূপে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত।

অধ্যায়ের উপসংহারে বলা যায় যে — লৌকিক সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য — পুরাণ, তন্ত্র ও আচার্যবর্গের রচনা — মূলতঃ এই তিনটি ধারা গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্ম-পুত্রের মতো প্রবাহিত হয়ে ভক্তিরসের সমভূমিতে অবতরণ করে — সমন্বিত হয়ে বাংলা প্রমুখ আধুনিক ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর অক্ষয় উৎস রূপে স্থিত। এই উৎসমূল থেকে-ই প্রধানতঃ ভক্তি-সাহিত্য ও সঙ্গীতের আধারে — নানা তরঙ্গভঙ্গীতে যে সাহিত্য স্রোতস্বিনী আত্মপ্রকাশ করেছে — তার প্রবাহ কিন্তু কেবল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়নি — আধুনিক সাহিত্য সঙ্গীতের মধ্যে-ও কখনো প্রকাশ্যে কখনো বা অন্তঃসলিলা রূপে সতত বিদ্যমান ও ক্রীড়াশীল। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে তার কথা আলোচিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও বাংলা

আদি - মধ্য যুগ

তৃতীয় অধ্যায়

সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও বাংলা আদি মধ্যযুগ

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ অনেকটা করা হয়েছে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের বরাবর। প্রাক্ ইসলাম শাসন পর্যন্ত অর্থাৎ দশম - দ্বাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যকে বলা হয় প্রাচীন বা আদিযুগ। মধ্যযুগ বলা হয়েছে অষ্টাদশ শতকের মোটামুটি মুসলমান শাসন অবলুপ্তি ও কোম্পানীর তথা বৃটিশ শাসনের সুরু পর্যন্ত কালকে। মধ্যযুগের আবার দুটি ভাগ। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে — বাঙালী জীবনে ও সাহিত্যে এক সর্বাঙ্গীন নব অভ্যুদয়ের ভাব-প্লাবন ঘটে যায়। প্রথম ভাগ চৈতন্য পূর্ব, আর দ্বিতীয়টি চৈতন্যোত্তর মধ্যযুগ। তারপর আধুনিক যুগ। ইংরাজ শাসনের শুরু থেকে অবস্থান পর্যন্ত কাল আধুনিক বা নব্যযুগ নামে অভিহিত। স্বাধীনোত্তর কালকে সাহিত্যিক বিচারে কোন নতুন নামে অভিহিত করা হয়নি। তবে শ্রীচৈতন্যদেবকে মধ্যখানে রেখে যেমন আদিমধ্যযুগ বা প্রাক্ চৈতন্য মধ্যযুগ ও অন্ত্য মধ্যযুগ বা চৈতন্যোত্তর মধ্যযুগ — এই দুটি ভাগ করা হয়েছে, তেমনি স্বাধীনতা লাভকে মধ্যস্থলে রেখে — আধুনিক যুগকেও আদি আধুনিক ও উত্তরাধুনিক দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

আদিযুগ

প্রাচীন যুগে বাংলাভাষা তার নিজরূপে স্থিতি পায় নি, শিক্ষিত মহল সংস্কৃত ভাষাকে মাধ্যম করেই সাহিত্য রচনা করেছেন ও রসাস্বাদন করেছেন। সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। শরণ, ধোয়ী, উমাপতিধর, গোবর্ধনাচার্য ও সর্বোপরি জয়দেব প্রমুখ বাঙালী কবিগণ সংস্কৃত সাহিত্য রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান কবি ছিলেন কবি জয়দেব। তাঁর শ্রী গীতগোবিন্দ — কাব্যের রাধাকৃষ্ণের লীলার মধুময়ী গীতিকথা সর্বভারতীয় ভক্তি সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়েছিল প্রথম থেকেই। লোকস্তরে বা তথাকথিত অশিক্ষিত পাঠক মন্ডলে সমকালের

বাংলাভাষায় প্রথম পরিচয় আছে চর্যাপদগুলিতে। সে যুগের সাহিত্যের মূল বিষয় ছিল ধর্ম। কাজেই বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সাধন পদগুলি-ই চর্যাপদে সংকলিত। এই আদি যুগের শেষপাদে আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেমলীলা। এই গ্রন্থেও বাংলা ভাষার রূপটি চর্যাপদের ভাষা থেকে স্পষ্টতর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব পদাবলীর আদিম ও গ্রাম্য রূপটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে। চর্যাপদাবলী র মতো শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-ও গান সুরে তালে গেয়। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গানগুলির মধ্যে উত্তর - প্রত্যুত্তরের জন্য নাটকীয়তা আছে। উল্লেখযোগ্য যে গীতগোবিন্দের ভাবভাষা সুর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে সমৃদ্ধ করেছে নানা দিকে। ভক্তি ভাবের দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও সংস্কৃত স্তোত্রের রূপগত দিকটি কিন্তু অপরিস্ফুট।

মধ্যযুগ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে মোটামুটি তিনটি শাখায় ভাগ করা হয়। মঙ্গল সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ও বৈষ্ণবসাহিত্য। মঙ্গল সাহিত্যের মধ্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল প্রধান শাখা। নির্দিষ্ট পালা বা কাহিনী ছকে এগুলি রচিত এবং আসরে পাঁচালীর ঢং-এ গান করা হতো। অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে প্রধান ধারা রামায়ণ ও মহাভারত। ভাগবতের ধারাটি অনেকের মতে শীর্ণ। বৈষ্ণব সাহিত্যের মুখ্যধারা পদাবলী ও কৃষ্ণকাহিনী। চৈতন্যোত্তর যুগে আর একটি ধারা যুক্ত হয়েছিল চরিত সাহিত্য অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্য জীবনকে অবলম্বন করে একটি নতুন শাখার প্রবর্তন হয়েছিল। এগুলির মধ্যে স্তোত্র সাহিত্যের — কেবল গৌণ নয় ক্ষেত্র বিশেষে মুখ্য প্রভাব-ও পড়েছিল স্পষ্ট করে। ধর্মীয় সাহিত্য মানেই ভক্তি সাহিত্য — আর ভক্তির অন্যতম বিষয় ভজন কেন্দ্রিকতা। কাজেই নানা ভাবে ও আকারে স্তোত্র সাহিত্যের সঙ্গে — মুখ্যতঃ আবেগের তুঙ্গক্ষণে — সাদৃশ্য রূপগতভাবে-ও অগোচর থাকে না।

মঙ্গল কাব্য

এই সময়ে ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ বঙ্গে মুসলমান শাসন কাল পর্যন্ত মোটামুটি এক ধরণের পাঁচালী বা কাহিনী কাব্য বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল বাংলা সাহিত্যে তার নাম মঙ্গল কাব্য। লৌকিক দেবতাদের মহিমা কীর্তন-ই ছিল এই কাব্যের মূল কথা। বহু দেবতা সম্বন্ধে মঙ্গল কাব্য রচিত হলেও, এর মুখ্য ধারা ছিল তিনটি — মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল ও ধর্ম মঙ্গল। নিয়মিত পূজার্চনা ছাড়া — অবশ্যই দেবদেবীর মহিমা জ্ঞাপক পাঁচালী — গাওয়া ও শ্রবণ করা হোত। কেন মঙ্গল কাব্য বলা হোতো — তার নানা কারণের মধ্যে মুখ্য — সহজ কারণ বোধহয় ছিল এই যে ইহা শ্রবণ করলে মঙ্গল বা কল্যাণ হবে এই বিশ্বাস। দেবদেবীর নামের সঙ্গে মঙ্গল — কথাটি লেখা থাকত। মঙ্গলের বদলে বিজয় শব্দটিও দেখা যায় — যেমন মনসাবিজয়। পরবর্তী কালে মঙ্গল কাব্য রচনার কয়েকটি স্থির রীতি বা নিয়ম চালু হয়ে ছিল। গ্রন্থোৎপত্তির মূল হেতু ছিল — কবিকে দেবদেবী কর্তৃক স্বপ্নাদেশ। দেবতার মহিমা প্রকাশের জন্য স্বর্গ থেকে দেবযোনি নারীপুরুষ, অভিশপ্ত হয়ে মর্তে নায়ক - নায়িকা রূপে জন্ম গ্রহণ এবং দেবমহিমাদি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন। এটি মূল ছক। আরও গৌণ লক্ষণ বা রীতি ছিল। লোককথার সঙ্গে বিদগ্ধ সংস্কৃত ধারার মিলন হয়েছিল এই কাব্যে — এবং প্রতিভাবান কবিরাই মঙ্গলকাব্য রচনা করতেন।

মনসা মঙ্গলের কাহিনীর মূল কথা পরম শৈব চন্দ্রধরের কাছ থেকে মনসার পূজা আদায়ের প্রচেষ্টা ও সাফল্য। বেহুলা - লক্ষীন্দরের — শাপভ্রষ্ট উষা - অনিরুদ্ধের সাহায্যে এই কাজটি সাধিত হয়েছিল, মনসা মঙ্গল কাহিনীর ব্যাপ্তি সীমা ছিল বঙ্গ - বিহার - কামরূপ আসাম পর্যন্ত। বহু কবি রচনা করেছেন মনসা - মঙ্গল কাব্য — তার মধ্যে বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস, কেতকাদাস দ্বিজ বংশী, প্রমুখের স্থান প্রধান।

চণ্ডীমঙ্গলে কাহিনী দুইটি। একটি আখেটিক খণ্ড — অর্থাৎ কালকেতু ফুল্লরার, অপরটি বণিক খণ্ড — ধনপতি সদাগরের আখ্যান। চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাপ্তি সীমা ছিল গোটা বঙ্গদেশ। এখানে চণ্ডীদেবীর মহিমা কীর্তন। কবি গোষ্ঠীর মধ্যে মুকুন্দ রাম, কবি কংকণ, মাণিক দত্ত, দ্বিজ মাধব প্রধান। এই চণ্ডী পরিমণ্ডলেই রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে — অন্নদা মঙ্গল। এই শাখার শ্রেষ্ঠ কবি রায় গুণাকর ভারত চন্দ্র, ভারতচন্দ্রের অন্যতর গৌরব তিনি সমগ্র মঙ্গল কাব্য সাহিত্যের শেষ কবি, সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ কবিও।

ধর্মমঙ্গলের বিষয়টি কাহিনীর দিক থেকে প্রাচীন হলেও রচিত হয়েছিল সপ্তদশ শতকে। গৌড়েশ্বর তার সুন্দরী শ্যালিকাকে বিবাহ দিয়েছিলেন করুণাবশে বৃদ্ধ কর্ণ সেনের সঙ্গে। ধর্মঠাকুরের আরাধনা করে — রঞ্জাবতী লাউসেনকে পুত্ররূপে পান, লাউসেন অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের সীমা অত্যন্ত সংকীর্ণ। রাঢ়দেশের বাহিরে কোন ধর্মমঙ্গল রচিত হয়নি। এই ধারার প্রচীন কবির নাম ময়ূর ভট্ট, তারপর রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম, ঘনরাম প্রমুখ কবিগণ ধর্মমঙ্গল রচনা করে খ্যাতি পেয়েছেন।

সব মঙ্গল কাব্যের মূল কথা দেব ভক্তি — কিন্তু তিনটি ধারার মধ্যে মূল সুরের পার্থক্য আছে — মনসামঙ্গলের সুর করুণ, চণ্ডীমঙ্গলের — শান্ত আর ধর্মমঙ্গলের বীর রসের প্রাধান্য।

এই সঙ্গে শিবায়ণ কাব্যের নাম-ও উল্লেখযোগ্য। এটি-ও বিষয়গত ভাবে পুরানো হলেও রচনা সপ্তদশ শতকে।

সকল মঙ্গল কাব্যের প্রথমেই বন্দনাংশ থাকে। বৈদিক সাহিত্য ও প্রাচীন শাস্ত্রের প্রারম্ভে শান্তিবচন ও স্বস্তিবাচনাদি আছে মঙ্গলাচরণের মতো। গ্রন্থারম্ভের এই অংশের মধ্যে — প্রার্থনায় মঙ্গল সুর শোনা যায়। কোন কোন মঙ্গল - কাব্যে যথা বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ — প্রথমে মূল দেবতার বন্দনা থাকলেও সাধারণ ভাবে মঙ্গল কাব্যের, প্রথমেই গণেশ ও সরস্বতীর বন্দনা থাকে। তারপর অন্যান্য দেবতার

ও মুখ্য দেবতার। মনসা বা চণ্ডী বা ধর্মঠাকুরের প্রভৃতির ।

গণেশ বন্দনার সঙ্গে গণেশস্তোত্রের রূপ ও বিষয়গত সাদৃশ্য — বিশেষ করে মহিমা বর্ণনের দিক থেকে ঐক্য দেখা যায় । যথা ——

বেদান্ত দরশনে ব্রহ্ম বলি বাখানে
অন্যে বলে পুরুষ প্রধান
বিশ্বের পরমগতি হেতুঅন্তরায় পতি
তাঁরে মোর লক্ষ পরণাম ॥
কন্দদেব গণপতি দেবের প্রধান ॥

ইত্যাদি মুকুন্দ রামের গণেশ বন্দনা অথবা

গণেশায় নমঃ নমঃ আদি ব্রহ্ম নিরূপম
পরম পুরুষ পরাৎপর ।
খর্ব স্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরম সুন্দর ॥

ভারতচন্দ্রের এই গণেশ বন্দনার থেকে ——

গণেশ স্তোত্রের — ভাব ও রূপ গত সাদৃশ্য অস্পষ্ট নয় ।

গণেশ হেরম্ব গজাননেতি মহোদর স্বানুভব প্রকাশিন্ ,
বরিষ্ঠ সিদ্ধিপ্রিয় বুদ্ধিনাথ বদন্তসেবং ত্যজত প্রভীতাঃ ।

ইত্যাদি খুব সাদৃশ্য লক্ষণীয় । এইরূপ সরস্বতী বন্দনা ও সরস্বতী স্তোত্রাদির সাদৃশ্য সুস্পষ্ট ।

তাছাড়া কাব্যাদির মধ্যে কালী, শিব, মনসা, প্রমুখ দেব দেবতার যে স্তুতি আছে — তার সাদৃশ্যও চক্ষু এড়ায় না ।

তারপরে মূল দেবতার বন্দনা যথা চণ্ডীমঙ্গলে — চণ্ডীর বন্দনা

(১) বন্দ নারায়নী ভৈরবী ভবাণী
নগেন্দ্র নন্দিনী চণ্ডী ।
বীণা সপ্ত সুরা মুরজ মন্দিরা
বাজায়ে ডুণ্ডুভি ভিন্ডি ॥ (মুকুন্দ রাম)

(২) অন্নদামঙ্গলে অন্নপূর্ণা বন্দনা —

অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
কোটি কোটি করিয়ে প্রণাম ।
আসরে আসিয়া ভর নায়কের আশাপূর
শুন আগে তার গুণগ্রাম । (ভারত চন্দ্র)

(৩) মনসা মঙ্গলে মনসা বন্দনা —

বন্দিলাম বন্দিলাম মাগো মন্ত্রে দিয়া ঘা
অবধান কর গো জগৎ গৌরী মা ॥
হংস বাহনে বন্দম দেবী পদ্মাবতী ।
অষ্ট নাগ লইয়া মা এস শীঘ্র গতি ॥ (বিষয় গুপ্ত)

(৪) ধর্মমঙ্গল —

নমো ধর্ম অবতার নিত্য নিরঞ্জন
নির্বিকার নির্বিকল্প সত্য সনাতন ॥
অনন্ত তোমার লীলা অন্ত পাওয়া ভার
ভ্রান্ত আমি কি বুঝিব মহিমা তোমার ॥ (ময়ূর ভট্ট)

(৫) শিবায়ন —

জয় জয় মৃত্যুঞ্জয় জগদীশ জগময়
জগদ্ বীজ যোগীন্দ্র পুরুষ ।
দারুণ দারিদ্র্যদ্রুম দহে দাবানল সম
দূর কর দাসের কলুষ ॥

মঙ্গলকাব্যের স্তবের মুখ্যতঃ তিনটি ধারা — এক মহিমা বর্ণাত্মক, দুই — কোন অপরাধের জন্য মার্জনা প্রার্থনা; তিন — বিপদ থেকে মুক্তির আকুলতা ।

যেমন (১) মহিমা বর্ণাত্মক প্রার্থনা — চণ্ডীমঙ্গ কালকেতু উপখ্যানে কলিঙ্গ ভূপতির কৃত স্তব —

দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতি নাশিনী ।
গোকুল রাখিলা হয়ে যশোদা নন্দিনী ॥
নিদ্রারূপা হয়ে তুমি ভাঙ্গিলা প্রহরী ।
যেকালে দেবকী গর্ভে জন্মিলা শ্রীহরি
ইত্যাদি

(২) ধনপতির অপরাধের জন্য চণ্ডীর কাছে খুল্লনার মার্জনা ভিক্ষা —

ক্ষম অপরাধ করহ প্রসাদ
কৃপাময়ী নারায়ণী
* * *
কৌশিকী কৌমারী রোগ শোক হারী
বারাহী বিন্ধ্য বাসিনী ।
উগ্রচণ্ডী চণ্ডী চণ্ডমুণ্ড দণ্ডী
রক্তবীজ বিনাশিনী
ক্ষম অপরাধ করহ প্রসাদ
হৈমবতী পদ্মাবতী ॥ ইত্যাদি

(৩) ধনপতি উপখ্যানে মশানে নীত শ্রীমন্তের প্রাণ রক্ষার জন্য স্তুতি —

দুর্গতি নাশিনী দুর্গা জগতের মাতা ।
শৈলেশ নন্দিনী শিবে দেবের দেবতা ॥
* * *
বিধি প্রতিকূল যা নৃপতি করে বল ।
তব নাম অনুপমে বিপদ কুশল ॥ ইত্যাদি

অভিজন স্তোত্রের মূল তথা একমাত্র বিষয়টি হল স্তুত্য অভিজন বা দেবতার মহিমা - রূপ, গুণ, কর্মকীর্তি ইত্যাদির উল্লেখ । কাজেই গুণবাচক বিশেষণের

তালিকা স্তোত্রের একটি বিশেষ অঙ্গ । বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্রাদি দেবতাদের স্তবে-ও এই রীতিতে-ই করা । সংস্কৃত সাহিত্যের তন্ত্র পুরাণাদিতে-ও এই ধারা অনুসৃত । মঙ্গলকাব্যে, শুধু মঙ্গলকাব্যে কেন, বাংলায় রচিত স্তবস্তোত্রে-ও এই ভাবেই করা হয়েছে মহিমা প্রকাশ-ও নানা কীর্তি প্রকাশক নামমালা ।

ইন্দ্র দেবতার স্তোত্রের কথা বলা হয়েছে । কিন্তু বৈদিক দেবতা রূপে পরবর্তী কালে অধিকতর জনপ্রিয়ত্ব অর্জন করেছিলেন বিষ্ণু, রুদ্র প্রমুখ দেবতাগণ । তাই — অতো দেবা অবন্তু নঃ — ইত্যাদি বিষ্ণুসূক্ত (ঋগ – ১।২২) । হিরণ্য গর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে – ইত্যাদি হিরণ্য গর্ভ সূক্ত (ঋগ্বেদ – ১০।১২১), "সহস্র-শীর্ষ পুরুষঃ ইত্যাদি — পুরুষ সূক্তম্ (ঋগ্বেদ – ১০।৯০), অহং রুদ্রেভিঃ – ইত্যাদি দেবী সূক্তম্ (ঋগ্বেদ – ১০।১২৫) প্রমুখ বৈদিক সূক্তের মতো পুরাণে তন্ত্রে-ও শিব, বিষ্ণু, কালিকাদি দেবতার অজস্র স্তবস্তুতি পাওয়া যায় । সব ক্ষেত্রেই এই রকম ।

বাংলা মঙ্গল কাব্যে স্তোত্রগুলির মধ্যে নামমালা যেমন আছে তেমন আছে চৌতিশা স্তব । এটি মুখ্যতঃ বাংলা মঙ্গল কাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । সংস্কৃত স্তোত্রের মতো — গুণ ও নামের মালা সাজিয়ে অনেক স্তব আছে মঙ্গল কাব্যে । যেমন কালকেতুর চণ্ডী স্তব নগর নির্মাণের পূর্বে ।

আদ্যা সনাতনী শঙ্কর গৃহিনী
শক্তিরূপা তিন দেবে ।

ইত্যাদি স্তবে — শঙ্খিনী, শূলিনী, কপাল মালিনী, ধাত্রী, শাকম্ভরী, গৌরী দিগম্বরী, জয়ন্তী, কালী, মঙ্গলা, দুর্গা শিবা, ক্ষমা, চণ্ডী, চণ্ডভী মা, বালশশি শিরোমণি, ভৈরবী, ভারতী, বসুমতী কৌশিকী, কুমারী, বারাহী, উগ্রা, উগ্রচণ্ডী, বাসন্তী, চামুণ্ডা, মহাকালী, বর্গভী মা, কপর্দিণী সিংহবাহিনী, মহিষ মর্দিনী – প্রমুখ পঞ্চাশাধিক নাম আছে । মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বিবিধ চণ্ডী স্তবের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য সুস্পষ্ট ।

চৌতিশা একটি বিশেষ স্তব । ৩৪টি ব্যঞ্জন বর্ণ যোগে এই স্তব করার রীতি । চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দ রাম উভয় খণ্ডেই চৌতিশা স্তব দিয়েছেন —

কালকেতুর মুখে ও শ্রীমন্তের মুখে। বর্ণ ভিত্তিক শ্লোক সংখ্যা কম বেশি অর্থাৎ কোন বর্ণে - ২ শ্লোক, অধিকাংশ ৪ বা ৬ শ্লোক। কিন্তু কোন স্তবই ৩৪ বর্ণের হয়নি। ৩১।৩২ বর্ণের হয়েছে। ঙ, ঞ, ণ — বাদ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য কালকেতুর স্তবে 'ঙ' স্থলে উ ধরা হয়েছে। আবার মাণিক দত্তের চণ্ডী মঙ্গলে 'ঙ' স্থলে —'উ', 'ঞ' স্থলে —'ই' ণ স্থলে মু, 'য' স্থলে জ হয়েছে কোথাও চৌত্রিশা বর্ণের আদ্যাক্ষর যুক্ত শব্দমালা নেই। পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্র অন্নদা মঙ্গল কাব্যে — সুন্দরের মুখে — স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ মিশিয়ে পঞ্চাশৎ বর্ণমালা দিয়ে স্তব রচনা করেছেন।

সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে।
ভারত কহিছে কালী জানিলা অন্তরে॥

চৌত্রিশা — যদি পারিভাষিক শব্দ হয় — তবে চৌত্রিশ বর্ণে কম ৩১।৩২ বর্ণে বা স্বরব্যঞ্জন যুক্ত পঞ্চাশৎ অক্ষরে — স্তব মালাকে চৌত্রিশা বলা চলে না কি?

এই রকম বর্ণানুগ স্তবের সন্ধান পাওয়া যায় — বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মধ্যখণ্ডে বিংশ অধ্যায়ে গঙ্গা স্তবে। সেখানে ক থেকে ক্ষ পর্যন্ত সব বর্ণেরই শব্দ দিয়ে গাথা গঙ্গার চৌত্রিশা।

কন্যা কল্পলতা কেলিঃ কল্যাণী কল্পবাসিনী।
কলি কল্মষ সংহন্ত্রী কাল কানন বাসিনী॥

*　　*

ঙন্ডা ঙ কারিণী ঙেংশী ঙ কার বর্ণ সংশ্রয়া।

*　　*

ঞ কারেণী ঞ কারস্থা ঞ বর্ণ মধ্য নায়িকা।

*　　*

ণ কার বর্ণ ধরণী ণ কারী কাল ভাবিনী।

*　　*

হরি কন্যা হরিসুতা হরিদবর্ণা হরীশ্বরী।
ক্ষেমঙ্করী ক্ষেম রূপা ক্ষুরধারাস্থাশিনী॥ ২।২০।১৬১

কিন্তু এখানেই স্তবটি শেষ হয়নি এই চৌত্রিশ বর্ণের পরও কিন্তু এই স্তবে স্বরবর্ণের উল্লেখ আছে —

অনন্ত ইন্দিরা ঈশা উমা ঊষা ঋকারিকা ।
ঋষ্য রূপা ৯ কারান্তা ৯৯ কারী এশিতা তথা,
ঐশ্বর্য কারিণী ওঔকারিনী ঔষ কারিণী
অঙ্কশূন্যা অঙ্ক ধরা অর স্পর্শা অস্ত্রধারিনী
সর্ব বর্ণময়ী বর্ণ ব্রহ্মরূপাখিলাত্মিকা ।
প্রসন্না শুভ্রদশনা পরসার্যা পুরাতণী ॥ ২।২০।১৩

অর্থাৎ এখানেও পঞ্চাশৎ বর্ণমালা ।

আসল কথা প্রতিটি বর্ণ দিয়ে শব্দ যোজনা করে স্তব করা । ৩৪ ব্যঞ্জনে বাংলা -য় চৌত্রিশ । আর সংস্কৃত স্বরব্যঞ্জন বর্ণ মিলিয়ে — পঞ্চাশৎ বর্ণাত্মিকা বর্ণনা ।

বিস্ময়, ভয়, প্রীতি এই ভাবাবেগের একক বা মিশ্রিত -- রূপের মধ্যে দেবমহিমা, ভক্তি ও স্তোত্রাদির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন স্থান- কালে, নানা রূপে ও রূপকে । ভারতের পঞ্চোপাসক নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে — গাণপত্য ও সৌর ধারা যথাক্রমে শৈব - শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধারার সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে । বৈরাগ্য বিভূতি মন্ডিত মহাযোগী শিব কদাচিৎ — মুখ্যতঃ পৌরাণিক ও লৌকিক কল্পনায় স্বতন্ত্র রূপে পূজাপ্রার্থী হয়েছেন — বা সাহিত্য মন্ডলে প্রবেশ করেছেন । শক্তির সঙ্গে অবিনাভাবী ও সহজ সম্বন্ধে সর্বত্র শিবের অবস্থান — উদার উদাসীন পটভূমি রূপে মহাকাশের মতো তাই মঙ্গলকাব্যাদিতে মুখ্যতঃ মনসামঙ্গল ও চন্ডীমঙ্গলাদিতে — শিবের ভান্ডার লুট করে ভক্ত আদায় করেছেন — চন্ডী ও মনসা । পতির সম্পত্তি বা পিতার ঐশ্বর্যে ভাগ বসিয়েছেন । একারণে শাক্ত পুরাণে ও তন্ত্রে অগ্রাধিকার লাভ করেছেন — শক্তি ও শক্তিরূপা কালিকা বা মহাবিদ্যাগণ । মধ্য যুগে ধর্মমঙ্গলের ধারা উত্তরকালে শৈব - সিদ্ধাই — বাউল ধারার মধ্যে নবরূপ পেয়েছে বলে পন্ডিতগণ মনে করেন । অপর দুটি বৈষ্ণব ও শাক্ত ধারাযুগল প্রাধান্য লাভ করেছে নানাদিকে ।

তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে কলিযুগে কৃষ্ণ ও কালী -ই মুখ্য দেবতা। মধ্যযুগের কাব্যশাখায় অনুবাদ সাহিত্য বাদে মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য প্রধান। বৈষ্ণব সাহিত্যের তিনটি শাখা — কৃষ্ণ কাব্য, চরিত সাহিত্য ও পদাবলী — শাখাত্রয়ের মধ্যে অবশেষে — বৈষ্ণব পদাবলীর আধারে হয়েছে তার কালজয়ী প্রাণোচ্ছল উত্তরণ। মঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রেও শাক্তপদাবলীতে ঘটেছে পর্যাবসান।

শাক্ত পদাবলী সুরধুনী ধারায় উৎস বা গোমুখ — কবি রঞ্জন রাম প্রসাদ সেন। অষ্টাদশ শতকের, অর্থাৎ মধ্যযুগের অন্ত্য পর্বে রামপ্রসাদের আবির্ভাব (১৭২৩) বৈষ্ণবপদাবলীর আদলে — মুখ্যত কালী মাতাকে আধার করে তিনি সাধন সঙ্গীত রচনা করেছেন। শক্তি পদাবলীকেও পণ্ডিতগণ মোটামুটি তিনটি শাখায় ভাগ করেছেন, এক — দেবীর লীলা কাহিনী অর্থাৎ আগমনী - বিজয়া দুই — দেবীর মহিমা কীর্তন, আর্তি ও প্রার্থনা। তিন — দেবীর তত্ত্ব ও রূপাদি বর্ণন ও বিশ্লেষণ। এই ধারাগুলি উত্তর কালে প্রবলভাবে প্রবাহিত হয়ে উনবিংশ শতকে পাঁচালী, যাত্রা, কবিগান প্রমুখ আঙ্গিকে প্রভূত বৈচিত্র্য ও খ্যাতি অর্জন করেছিল। এর মধ্যে যেটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য ক্রমশ ফুটে উঠেছিল তা ভক্তির ক্ষেত্রে কৃষ্ণ ও কালীর বিরোধ নয়, মিলন অভেদত্ব আস্বাদন। এই ভাবের পরম ও চরম প্রকাশ হয়েছিল — ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেবের জীবনে ও উপদেশাদিতে এবং 'যত মত তত পথ' — সিদ্ধান্ত ঘোষণায়।

যা হোক রামপ্রসাদের উমাসঙ্গীতে বিশেষত আগমনী - গানের গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা — উনবিংশশতক পর্যন্ত বাঙালী সমাজে ও সাহিত্যে অন্তরঙ্গভাবে অভ্যর্থিত হয়েছিল। আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন ——

"রামপ্রসাদ-ই আগমনী গানের প্রথম কবি। তৎপূর্বে উমা ও মেনকা লইয়া বাৎসল্য রসের ধারা কোন কবি বঙ্গসাহিত্যে বহাইয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। বাঙ্গালার কুটীরের বালিকা দুহিতাদের স্বামীগৃহে যাওয়ার পর মাতৃহৃদয়ের বিরহের হাহাকারকে করুণ রসের অফুরন্ত উৎস করিয়া যে সকল আগমনী গান পল্লীতে - পল্লীতে বহিয়া গিয়াছে সেই আগমনী গানের আদি গঙ্গা — হরিদ্বার এই প্রসাদ সঙ্গীত। আশ্বিন মাসের ঝরা শিউলি ফুলের মত এই যে মাতৃ মিলনের প্রত্যাশায় বালিকা বধূদের

চক্ষুজল দিনরাত্র ঝরিত এই সকল আগমনী গান সেই সকল অশ্রু রচিত হয়ে, উহা তাৎকালিক বঙ্গজীবনের জীবন্ত বিচ্ছেদ - রসপুষ্ট ।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য – পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ সংস্করণ, পৃ. ৬২৯)

গিরি , এবার আমার উমা এলে
আর উমা পাঠাব না ।
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না ॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয় —
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া
বাজাই বলে মানব না ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয় , এ দুঃখ কি প্রাণে সয়
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥

এই সুর । তারপর এই ধারাটি যে বিপুল স্নেহ-রস বন্যা সৃষ্টি করেছিল শাক্ত-গীতি ও সাহিত্যের নানা শাখায় তার বৈচিত্র্য পরিচয় যথাস্থানে – (চতুর্থ অধ্যায়) দেবার চেষ্টা করা যাবে ।

দেবীর মহিমা কীর্তন, আর্তি ও প্রার্থনা পদে — রাম প্রসাদের পদগুলি সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ হয়ে আছে । দুঃখ কষ্টের জন্য অভিমান অভিযোগ, নিজের অক্ষমতার জন্য বেদনা — আত্মসমর্পণের দুর্দান্ত আবেগ ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্যে তা মধুর ।

(ক) "আমায় দেও মা তবিলদারী
আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী ।"

(খ) "ডুব দেরে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ।"

(গ) "মা আমায় ঘুরাবে কত ।
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ।"

(ঘ) "মন কৃষি কাজ জান না। এমন মানব জমিন
রইল পতিত। আবাদ করলে ফলত সোনা"

(ঙ) কে জানে গো কালী কেমন। ষড় দর্শনে না পায় দরশন ॥

(চ) আমি নই আটাশে ছেলে। ভয়ে ভুলব না চোখ রাঙালে। ইত্যাদি বহু সঙ্গীত আছে।

তত্ত্ব ও রূপাদি বর্ণন বিষয়েও রামপ্রসাদ পথিকৃৎ ও সার্থক স্রষ্টা।

কে হর হৃদি বিহরে
তনু রুচির সজল ঘন নিন্দিত
চরণে উদিত বিধু নখরে।

এছাড়া সংগ্রামরতা মায়ের বর্ণনার যে ধারা উত্তর কালে ভক্ত সাধকগণ বহু বৈচিত্র্য রচনা করেছেন তার উৎসও প্রসাদী সঙ্গীতে পাওয়া যায় —

মা কত নাচগো রণে।
নিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ
বিবসনা হর হৃদে কত নাচগো রণে ॥

রূপ বর্ণনাদির আর একটি ধারা পাওয়া যায় — যাকে মূলতঃ সংস্কৃত ধ্যান মন্ত্রাদির মুক্ত অনুবাদ বললে খুব একটা ভুল বলা হয় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ঐতিহাসিক কারণেই — অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে শক্তি সাধনার দিকে ঝোঁক পড়েছিল বেশি এবং শক্তিসাধক ও শাক্ত কবি মণ্ডলে রাজা - জমিদার ও ভূস্বামীবর্গ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র প্রমুখ। নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ, বর্ধমানের মহারাজ মহাতাব চাঁদ প্রমুখ ভূস্বামীগণের নাম করা যেতে পারে। তাঁদের মধ্যে অনেকে দশমহাবিদ্যা সম্বন্ধে রচনা করেছেন। নরেশচন্দ্র কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, কমলার বন্দনা করে গীত - রচনা করেছিলেন। শিবচন্দ্রের তারা - রূপ বর্ণনা ———

নীলবরণী, নবীনা রমণী
নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণী ।

* * *

নিতম্বে বেষ্টিত শার্দুল ছাল
নীলপদ্ম করে করে করবাল ।
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দু করে
লম্বোদরী লম্বোদর প্রসবিনী,
নিপতিত পতি শব রূপে পায়
নিগমে হইতে নিগূঢ় না পায় ।
নিস্তার পাইতে শিবের উপর
নিত্যা সিদ্ধা তারা নগেন্দ্র নন্দিনী ॥

এবার তারার ধ্যান মন্ত্রটি উল্লেখ করা যাক —

প্রত্যালীঢ় পদার্পিতাঙ্ঘ্রি শবহৃদ্যোস্মেরাট্টহাসা পরা
খড়্গেন্দীবর কর্তৃ খর্পরভুজা হংকারবীজোদ্ভবা ।
সর্বা নীল বিশাল পিঙ্গল জটাজুটৈক নাগৈর্যুতা
জড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্ ॥

ভাবানুবাদের চমৎকারিত্ব লক্ষণীয় । এই ধারাটি উনবিংশ শতক পর্যন্ত সগৌরবে বিশেষ করে রাজন্যবর্গের লেখনীতে – প্রবাহিত ছিল । এই শাক্ত কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বর্ধমানের রাজা মহারাজ মহাতাব চাঁদ । মহারাজ মহাতাব চাঁদের আলোচনা উনবিংশ শতকের অর্থাৎ আলোচ্য গ্রন্থাবের চতুর্থ অধ্যায়ে করার কথা হলেও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনার জন্য এখানে দেওয়া হল ।

দশ মহাবিদ্যার মধ্যে ছিন্নমস্তাকে নিয়ে বেশ কয়েকজন কবি গীত রচনা করেছেন । এখানে মহারাজ শিবচন্দ্র ও মহারাজ মহাতাব চাঁদ দুজনের গীতি দুটি উল্লেখ করা যাক । সর্ব প্রথম ছিন্নমস্তার শাস্ত্রীয় ধ্যানমূর্তিটি পরিচয় দেওয়া যাক —

প্রত্যালীঢ় পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্তৃকাং
দিক্ বস্ত্রাং হৃদ্কন্ধ শোণিত সুধা ধারাং পিবন্তীং মুদা ।

নাগাবন্ধ শিরোমণিং ত্রিনয়নাং হৃদ্যুৎপলালং কৃত্যং
রত্যাসক্ত মনোভবোপরি দৃঢ়াং ধ্যায়েৎ জবসন্নিভাম্ ॥১॥
দক্ষে চাতিসিতা বিমুক্ত চিকুরা খর্পরং কর্তৃকাবন্ধ
হস্তাভ্যাং দধতী রজোপূর্ণভবা নাম্নাপি সা বর্ণিনী ।
দেব্যাশ্ছিন্ন কবন্ধতঃ পতৎসৃগ্ধারাং পিবন্তী মুদা
নাগাবন্ধ শিরোমণি ঘনবিদা ধ্যেয়া সদাবে সুরৈঃ ॥ ২
বামে কৃষ্ণ তনু স্তথৈব দধতী খড়্গং তথা খর্পরং
প্রত্যালীঢ় পদা কবন্ধ বিগলদ্ রক্ত পিবন্তী মুদা
সৈষা বা প্রলয়ে সমস্ত ভুবনং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী
শক্তিঃ সাপি পরাপরা ভগবতী নাম্না পরা তাদিনী ॥৩॥

মহারাজ শিব চন্দ্র রচনা করেছেন

এ নারীকে নারি চিনিতে, কার বণিতে
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করি ছিন্নমস্তা ভয়ংকরী
রক্তবর্ণা নগনা মগনা শোণিতে ॥
পদ্মমধ্যে কর্ণিকার কিবা সাধ্য বর্ণিবার
তিন মুখে শোভিত-ত্রিকোণ যোনিতে ॥
কণ্ঠোত্থিত রুধির ত্রিধার তার এক ধারা
ধরে কি মাধুরী জানিতে ।
আরোহন শবোপর রুধির পানে তৎপর
দুই ধার পিয়ে পাশে দ্বিযোগিণীতে ॥
বিপরীত রীত সহ রতি রতি পতি
তদুপরি মুরতি কৃপাণ পাণিতে ।
ছিন্নমুণ্ড করতলে অস্থি মুণ্ডমালা গলে
সুশোভিত যজ্ঞোপবীত ফণীতে ॥
আধ কলা চন্দ্রাননে কি শোভিত কলানাথ
নিত কপাল মালে দিনমণিতে ।

তন্ত্রে তুমি মুক্ত সিদ্ধি শিবে দে মা ইষ্টসিদ্ধি
অন্তে যেন যায় প্রাণ সুরধুনী তে ॥

আর — মহারাজ মহাতাব চাঁদের ভাষায় —

কে ও বিবসনা রুধিরে মগনা রক্তবর্ণা কার নারী ।
কমল কর্ণিকোপরি যোনিরূপা যন্ত্র হেরি ।
বিপরীত রতিকারি রতি কাম তদুপরি ,
তদূর্ধে বিরাজমানা প্রত্যালীঢ় চরণা
মুণ্ডমালা বিভূষণা ত্রিনয়না শঙ্করী ।
গলে অস্থিমালাস্থিতা, মুক্ত কেশে সুশোভিতা
লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী ॥
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করে বাম করতলে ধরে
শোভিত অসি অপরে চমৎকার মাধুরী
কণ্ঠ নির্গত ত্রিধার রুধির তার এক ধার
ধরে নিজাধযোপির ভীম রূপা ক্ষেমঙ্করী ।
উন্মত্তা উলঙ্গিনী পার্শ্বদ্বয়ে দ্বিযোগিনী
শেষ দ্বিধার ধারিনী বিস্তার বদন করি
করি কৃপাবলোকন শ্রীচরণে দিও স্থান
চন্দ্রের এই নিবেদন ছিন্নমস্তা শুভঙ্করী ।

মঙ্গল কাব্যের ধারায় — চণ্ডী মঙ্গল শাখায় অষ্টাদশ শতকের ভক্ত কবি রামপ্রসাদের উৎস মুখে যে শাক্ত গীত প্রবাহ উৎসারিত হয়েছিল তার তিনটি ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে । অন্তত ভক্ত হৃদয়ের আকুতি ও বৈচিত্র্য বিভিন্ন শিল্পের আঙ্গিকে অষ্টাদশ শতক পেরিয়ে উনবিংশ শতকে গীতের বন্যা তুলেছিল তার বিচিত্র পরিচয় পরের অধ্যায়ে দেবার প্রয়াস করা যাবে ।

অনুবাদ সাহিত্য

মঙ্গল সাহিত্য যেমন লোক মুখ থেকে অংকুরিত শিষ্ট শিক্ষিত ভক্ত বাঙালী কবি সম্প্রদায়ের প্রতিভা রসে পুষ্ট হয়ে সুগন্ধ ফুল রসাল ফল দান করেছে মধ্যযুগে। তেমনি অনুবাদ শাখাও সংস্কৃত মূল বিদগ্ধ সাহিত্য হিমবাহ হতে — বিশিষ্ট বাঙালী কবি প্রতিভার ভগীরথ বৃত্তির সাধনায় বঙ্গভাষী রসিকগণকে তৃপ্ত করেছিল। মাইকেল মধুসূদন কাশীরাম দাস সনেটে যে কথা বলেছিলেন —

চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত রস ঋষি দ্বৈপায়ণ
ঢালি সংস্কৃত হ্রদে রাখিলা তেমতি
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী
পরিত্রিলা আনি যায়ে এ তিন ভুবন।
সিইরূপ ভাষা পথ খননি সুবলে
ভারত রসের স্রোত আনিয়াছ তুমি ॥

এই উক্তিটি শুধু কাশীরাম দাস নয় — সমগ্র অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভবের মূল কথা।

মধ্যযুগের প্রথম ভাগে অনুবাদ সাহিত্যের মোটামুটি তিনটি মূল শাখা — ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত। প্রথম ভাগবতের অনুবাদ — পুরো গ্রন্থ নয় দশমস্কন্ধ থেকে শ্রীকৃষ্ণকথা খানিকটা করেছিলেন মালাধর বসু। নবাবের কাছ থেকে এই জন্য গুণরাজ খান উপাধি পান। কিন্তু রামায়ণ - মহাভারত অনুবাদের ধারার মতো ভাগবতের অনুবাদ ধারা সমৃদ্ধ হয়নি। অন্যান্য কৃষ্ণ কথার সঙ্গে মিশে — লীন হয়ে গেছে অবশ্য ভাগবতাচার্য রচিত শ্রীকৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিনী ও বহুলাংশে ভাগবতানুগ হলেও, কৃষ্ণকথা অবগাহনে — দৈবকী নন্দনের গোপাল বিজয়, কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণ বিলাস, কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল, পরশুরামের শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল প্রমুখ গ্রন্থগুলি এবং ভবানন্দের হরিবংশ কৃষ্ণকথা —হলেও তাকেও অনুবাদ করা যায় না।

পক্ষান্তরে অনুবাদ শাখায় রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ শাখা মধ্য যুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কৃত্তিবাস ছাড়া — অদ্ভুতাচার্য, দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ, ভবানীদাস, কৈলাস বসু, চন্দ্রাবতী প্রমুখ অনেক কবি রামায়ণ রচনা করেছেন। এই ধারা উনবিংশ শতকেও প্রসারিত ছিল। উত্তর কালে গদ্যানুবাদ হয়েছে অনেক। এদের মধ্যে কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালী কেবল প্রথম নয় — শ্রেষ্ঠ। তবে বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনীসমূহ — যা ভক্তিরসের অনুকূল ও সমধর্মী মিশিয়ে রচিত হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

মহাভারতের সর্ব শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় অনুবাদক রূপে কাশীরাম দাস গৃহীত হলেও, মহাভারতের অনুবাদ সুরু হয়েছিল অনেক আগেই। মুসলমান শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অপরিসীম। চট্টগ্রামে শাসক পরাগল খান মতান্তরে ছুটি খানের উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর পাণ্ডব বিজয় রচনা করেন, তা ছাড়া সঞ্জয় শ্রীকরনন্দী রামচন্দ্র খান, দ্বিজ রঘুনাথ প্রমুখ বহু কবি মহাভারত রচনা করে গেছেন।

রামায়ণ - মহাভারতের গুরুত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —" রামায়ণ ও মহাভারতকে কেবল মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে। রামায়ণ - মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস * * * রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছেন * * * গৃহাশ্রম আর্য সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। * * * রামায়ণ এবং মহাভারতকেও আমি বিশেষত এইভাবে দেখি। ইহা সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।" (প্রাচীন সাহিত্য)।

এই প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতি কুমারের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য -——" রামায়ণের একাধারে ভারতের গৌরবময় ধর্মাদর্শের কথা এবং মধ্যযুগের এবং আধুনিক কালে ভারতীয় গৃহস্থ জীবনের শুচিতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার কথা। * * * কৃত্তিবাসী রামায়ণে আমরা পাই সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় যে রামায়ণ কথা 'দেশিয়া' বিদ্যমান তাহার উপাখ্যানের

সংকলন ও সঙ্গে সঙ্গে ধরাধামে অবতীর্ণ দেবতা রামচন্দ্রের ললিত কোমল স্নেহ প্রবণ ভক্ত বৎসলদের প্রকৃতির কথা।" (সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা)।

অনুবাদের মধ্যে কী – রামায়ণ ও মহাভারত কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে, নাটকীয় সংলাপের মাধ্যমে শ্লোকের মধ্যে তার বিস্তার। অবশ্য ভগবৎ মহিমা জ্ঞাপক কথাগুলি সর্বত্র আলাদা করে থাকেনি শ্লোকে শ্লোকে সংলাপে, প্রার্থনায় আবেগে ছড়িয়ে আছে। স্থান মাহাত্ম্য নাম মাহাত্ম্যাদি বর্ণিত আছে — সূক্ষ্ম বিচারে অভিজন স্তোত্র নয় — দ্রব্য বা বিধিস্তোত্র —

(ক) শমন দমন রাজন রাজা রাবণ দমন রাম।
শমন ভবন না হয় গমন, না লয় রামের নাম ॥
সুকৃত জনন দুকৃত দমন শ্রুতিমূল রামায়ণ।
শ্রবণ মনন করে যেই জন, তারে তুষ্ট নাম নারায়ণ ॥
(কৃত্তিবাসী রামায়ণ,

(খ) রামনাম কীর্তন —

রাম নাম বল ভাই মুখে বার বার।
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাই আর ॥
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে।
অশ্বমেধ ফল পাবে রামায়ণ শুনে।

* * *

যোগ যাগ তন্ত্র মন্ত্র যেই জন জানে।
তারে কি তরাবে রাম তরে নিজ গুণে ॥
মোর সনে কড়ি নাই পার হব কিসে।
কর বা না কর পার কূলে আছি বসে ॥
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে।
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যা কালে ॥
আপনি যে ভাঙ্গ প্রভু আপনি যে গড়।
সর্প হৈয়া দংশ তুমি ওঝা হয়ে ঝাড় ॥

এ ছাড়া বিশল্যাকরণ অনুসন্ধানের সময় হনুমানের পর্বত স্তব এবং লংকাকাণ্ডে দেবীর অর্চনা কালে রামচন্দ্র কর্তৃক দুইটি দুর্গাস্তব আছে —— যথা —

(১) সপ্ত শ্লোকে – দুর্গা স্তুতি

দুর্গে দুঃখ হরা তারা দুর্গতি নাশিনী ।
দুর্গমে সরনি বিন্ধ্য নিধি সিটি নিবাসিনী
দুরারাধ্যা ধ্যানসাধ্যা শক্তি সনাতনী
পরাৎপরা প্রকৃতি পুরাতনী ।

(২) ত্রিপদী ছন্দে একটি শ্লোকে ——

নমস্তে সর্বাণী ঈশানী ইন্দ্রানী
ঈশ্বরী ঈশ্বর জায়া
অপর্ণা অভয়া অন্নপূর্ণা জয়া
মহেশ্বরী মহামায়া ॥

আখ্যান কাব্য মহাভারতের রচনাও একই ধারায় বিবৃত । এখানেও তীর্থ মহিমাদি বর্ণিত আছে । যেমন বনপর্বে শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য ——

(ক) বামে সিন্ধু তনয়া নিকটে সুদর্শন
জগদ আগে শোভে তড়িৎ বসন ।

* * *

এই পঞ্চতীর্থ নীল শৈল মধ্যে বৈসে,
পাপ লেশ নাহি থাকে তাহার পরশে ॥

দ্রৌপদীর - ইন্দ্রের, ভীষ্মের, অদিতির , বিদুরের স্তবগুলি উচ্চাঙ্গের ও ভক্তিরসে মধুর । দ্রৌপদীর দুটি স্তব একটি বস্ত্র হরণের কালে, অপরটি দুর্বাসার পারণে । বস্ত্রহরণ কালে — ১০টি ত্রিপদীর শ্লোক —

(খ) ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু
অখিলের বিপদ ভঞ্জন ।

এই যে সভার মাঝ ইথে নিবারিতে লাজ
তোমা বিনা নাহি অন্যজন ॥

(গ) পুত্রদের পরাজয়ে অদিতির বিষ্ণুস্তোত্রটিতে নানা অবতারের কথা ও মহিমা

জয় জয় নারায়ণ জন দামোদর ।
শিষ্টের পালক, দুষ্ট বিনাশন ।
নম হয়গ্রীব মধুকৈটভ মর্দন ॥ ইত্যাদি

(ঘ) ভীষ্মের কৃষ্ণ স্তুতি আছে দুইটি । একটি শরশয্যাতে পতিত হয়ে ২২টি পয়ার শ্লোকে

শুন দেব নারায়ণ মোর নিবেদন
তোমার চরিত্র প্রভু জানে কোন জন ।
* * *
এই লও নিবেদন রহিল আমার
অন্তে যেন শ্রীচরণ দেখি হে তোমার ॥

অপরটি — শান্তি পর্বের শেষে — দেহত্যাগের প্রাক্কালে --- বারটি পয়ার শ্লোকে

নমো নমো নারায়ণ কৃষ্ণ সনাতন ।
সংসারের হেতু রূপ দেব নারায়ণ ॥
তুমি আদি তুমি মধ্য তুমি অন্ত রূপ ।
সকল ভুবন এই তব শেষ রূপ ॥ ইত্যাদি

( ) বিদুরের স্তবটিও ২০টি পয়ার শ্লোকে রচিত । পূর্ব পূর্ব স্তবের কিছু কিছু অংশ আছে । নানা অবতারের মহিমাদি বর্ণনা করা হচ্ছে

তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য রূপ ।
সকল সংসার প্রভু তোমার স্বরূপ ॥
* * *

নমস্তে নৃসিংহ রূপ দৈত্য বিনাশক ।
নমস্তে প্রহ্লাদ প্রতি কৃপা প্রকাশক

* * *

কৃপা করি মোরে স্নেহ কর হৃষীকেশ ।
তোমার মহিমা আমি না জানি বিশেষ ॥

নারদের কৃষ্ণ স্তব, অশ্বত্থামার শিব স্তব, মুনির কৃষ্ণ স্তবাদি আছে । কিন্তু সংস্কৃত স্তবের যে মহিমা ও ধ্বনি — কাশীরাম দাসের মহাভারতে তার কিছু মাত্র নেই — অবশ্য প্রত্যাশিত-ও নয় ।

বৈষ্ণব সাহিত্য

মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যকে মোটামুটি তিনটি শাখায় ভাগ করা যায় (ক) কৃষ্ণ মঙ্গলাদি কাব্য, (খ) চরিত সাহিত্য ও (গ) পদাবলী ।

(ক) কৃষ্ণ মঙ্গলাদি কাব্যের — ধারাটি অনুবাদ শাখার বন্ধন মুক্ত ও মঙ্গলকাব্য ধারার কাহিনী বর্জন শৈলীর সঙ্গে মিলে দাঁড়িয়েছে এক যুক্ত বেণীর মতো । এই পর্যায়ে দৈবকীনন্দনের গোপাল বিজয়, কৃষ্ণ দাসের শ্রীকৃষ্ণ বিলাপ, শংকর কবিচন্দ্রর গোবিন্দ মঙ্গল । পরশুরামের শ্রী কৃষ্ণমঙ্গল, অভিরাম দাসের গোবিন্দ বিজয় ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । প্রাক্ চৈতন্য কৃষ্ণকথা ও চৈতন্যোত্তর কৃষ্ণ কথার মধ্যে পার্থক্য যেন আকাশ পাতাল মুখ্যতঃ আবেগে, ঐকান্তিকতায়, শরণাগতির এক এক মুখিতায় । ভক্তিবাদের ক্ষেত্রেই উভয় ধারার ফসল তোলা হলে-ও বর্ণে গন্ধে স্বাদে এমন কি পরিমাণে-ও পার্থক্য আছে । এই পর্যায়ে কৃষ্ণ মঙ্গলাদির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যাদি বিশ্লেষণে করার ব্যাপারে প্রাক্চৈতন্য যুগের দৈবকীনন্দন রচিত গোপাল বিজয় ও চৈতন্যোত্তর অভিরাম দাস বিরচিত গোবিন্দ বিজয় গ্রন্থ — দুখানির আলোচনা করা যাক । গোপাল বিজয় গ্রন্থে ভাগবতের কাহিনীর সঙ্গে লৌকিক কৃষ্ণকথার মিশ্রণ আছে — শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মতো । বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথম দিকে ভাগবতের স্থল বিশেষের স্তবাদির ভাবানুবাদ আছে । যেমন অবতার গ্রহণের জন্য ক্ষীরোদ শায়ীর নিকট ব্রহ্মার স্তব ———

'বচনের অবিষয় তোহ্মার গুণ - নিচয়
রূপ নিরূপিল নহ মনে
বচন মনের পার তোহ্মার সহজাচার
স্তুতি করে কোন আগে আনে ॥ ইত্যাদি

অথবা — চতুর্ভুজ রূপ কারাকক্ষে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম গ্রহণ করার পর বসুদেব দেবকীর স্তবাদি ।

বসুদেবের উক্তি ———

সূক্ষ্ম রূপে পরব্রহ্ম তুহ্মি নির্বিকারী।
ব্রহ্মাদি দেবতা নহে ধ্যানে অধিকারী ॥

ত্রিগুণ অতীত নিরঞ্জন নির্বিকার ।

বচন মনের কাজ অগোচর সমাচার । ইত্যাদি

এই রকম বেশ কয়েকটি স্তোত্র আছে ।

পক্ষান্তরে গোবিন্দ বিজয় গ্রন্থ — সুরু হয়েছে গৌরাঙ্গ বন্দনা দিয়ে । প্রতি প্রসঙ্গ আরম্ভেই ধ্রুব পদ আছে । গোপাল বিজয় ও গোবিন্দ বিজয়াদি উভয় গ্রন্থ-ই রাগ রাগিণীর উল্লেখ আছে । ধ্রুব পদগুলি এই রকম —

হরি গাও গাও ভাইয়ে কাল যায় বয়্যা ।

জনম সফল কর কৃষ্ণ গুণ গায়্যা ॥ ধ্রু ॥

আর প্রসঙ্গারম্ভে সর্বত্রই আছে এই কথা

কৃষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা ।

সর্ব ধর্ম কর্ম কৃষ্ণ নাম বিনে বৃথা ॥

এই গ্রন্থে-ও মূল ভাগবতের ভাবানুগ কিছু স্তবাদি আছে — যথা ক্ষীরোদ শায়ীর প্রতি ব্রহ্মার স্তব —

জল শায়ি প্রভু ভগবান

দেবের বৈকুন্ঠ দেখ একবার ক্ষিতি রাখ

কৃপা করি দেহ প্রাণ দান ॥ ইত্যাদি

কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থসমূহে প্রাক্ চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর — তারতম্য থাকলে-ও পাঁচালীর সঙ্গে গীতের-ও প্রাধান্য আছে ।

(খ) চরিত সাহিত্য । বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং অভিনব অবদান চরিত সাহিত্য । এ যাবৎ কাল দেবতাগণ-ই — বৈদিক, তান্ত্রিক, লৌকিক সর্ব সাহিত্যেই ছিলেন, একমাত্র স্তবার্হ। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে তার পরিবর্তন ঘটল । মানুষের মধ্যেই তথা মানবাধারেই ভগবদ্ মহিমার দিব্য প্রকাশ হল । এই উৎস পথে উত্তর কালে মহা মানুষের চরিত্র সৃষ্টিতে আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল । বাংলা চরিতকথার

মধ্যে বৃন্দাবন দাস প্রথম ও অন্যতম সার্থক পথিকৃৎ। লোচন দাস, জয়ানন্দ প্রমুখ কবিগণ-ও শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতাশ্রয় করে চৈতন্য মঙ্গল লিখেছিলেন। তবে এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ চরিতকার শ্রী কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী।

বৃন্দাবন রচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত বাংলা চরিত সাহিত্যের প্রথম পদক্ষেপ। চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস" — বলেছেন কবিরাজ গোস্বামী। গ্রন্থখানি আদি, মধ্য, অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। শ্রী নিত্যানন্দের নির্দেশে গ্রন্থ রচনা করেন বৃন্দাবন দাস। সংস্কৃত ভাষায় বন্দনান্তে বাংলার প্রথম শ্লোক —

আদ্যে শ্রীচৈতন্য প্রিয় গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে।
তবে বন্দো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর॥

এর তাৎপর্য এই যে ভগবান অপেক্ষা ভক্তের গৌরব মর্যাদা অধিকতর এই আদর্শে কিছু ত্রিপদী থাকলে-ও মুখ্যত বাংলা পয়ার ছন্দ রচনার মধ্যে শ্রীভাগবতাদি ছন্দে রচনা করেছেন বৃন্দাবন দাস তাঁর অনবদ্য চরিতকাব্য। এই পদ্ধতি উত্তর কালেও অনুসৃত হয়েছে। মাঝে মাঝে রাগরাগিণী উল্লেখ সহ গীতের ধ্রুপদাদি দেওয়া হয়েছে। যেমন আদি খণ্ড প্রথম অধ্যায়ে —

শ্রী রাগ

কি আরে রাম গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা রুদ্র সুর সিদ্ধ মুনীশ্বর
আনন্দে দেখিছে॥ ধ্রু॥

আসরে আসরে এই কাব্যগুলি পাঠ করা হোতো না। পাঁচালীর আদলে আবৃত্তি ও গীতাদি সহযোগে পরিবেশন করা হোতো। মধ্য যুগে এইটি-ই ছিল শ্রবণাস্বাদন রীতি সাধারণের জন্য। এই জন্য-ই আচার্য ড: সুকুমার সেন কেবল শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থকে মধ্যযুগের প্রথম পাঠ্যকাব্য বলে নির্দেশ করেছেন। যা হোক শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বেশ কিছু বাংলা স্তব আছে। শ্রীকৃষ্ণ জন্মের পূর্বে দেবগণ যেমন দেবকীর গর্ভ বন্দনা করেছিলেন কংসের কারাগারে — সেই আদর্শে করা —। আদি খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে

১৪৭ শ্লোক থেকে ১৮৮ পর্যন্ত সুদীর্ঘ স্তব । প্রথম শ্লোক —

জয় জয় মহাপ্রভু জনক সভার
জয় জয় সংকীর্তন হেতু অবতার ॥

তারপর ভগবানের নানা অবতারের বিবরণ দিয়ে —

এই অবতারে ভাগবত রূপ ধরি ।
কীর্তন করিল সর্ব শক্তি পরচারি ॥

বরাহ আবেশ মূর্তিধারী মহাপ্রভুকে — মধ্য খন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে সাতটি শ্লোকে (২৮-৩৪) স্তব করেছেন মুরারি গুপ্ত ——

অনন্ত ব্রহ্মান্ড যার ফনা এক ধরে ।
সহস্র বদন হই যারে স্তুতি করে । ইত্যাদি

এই খন্ডেই দশম অধ্যায়ে আর একটি গৌরাঙ্গ স্তব আছে মুরারির ২৭টি শ্লোকে (২১৩ – ২১৮)। ভক্তিই প্রধান এবং ভক্তিতেই ঈশ্বর লাভ হয় — এই মর্মে ।

ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি এই ছার মুখে ।
দেখিলেই ভক্তি শূন্য কি পাইব সুখে ॥

* * * *

কীট হই না মানিলুঁ মুঞি হেন ভক্তি
আনো তোমা দেখি যারে আছে কোন শক্তি ?

মধ্যখন্ডে একাদশ অধ্যায়ে মালিনীর শ্রী নিত্যানন্দ স্তোত্রটি আটটি শ্লোকে (৪৭ - ৫৬)

যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন ।
যে জন পালন করে সকল ভুবন ॥

ইত্যাদি স্তবটি ছোট হলেও ভক্তি রস গাঢ় ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জগাই মাধাই কর্তৃক গৌর নিতাই বন্দনা

জয় জয় মহা প্রভু জয় বিশ্বম্ভর ।
জয় জয় নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর ধর ॥ ইত্যাদি স্তোত্রটি ৩৬ শ্লোকে

(২৪৮ - ২৮৩) রচিত এবং তা সরল - সরস ভক্তিরসে স্নিগ্ধ ।

এই খন্ডে — পঞ্চদশ অধ্যায়ে আলাদা করে মাধাই -র আর একটি নিত্যানন্দ স্তুতি আছে ৪১টি শ্লোক (২১ - ৬১) ।

বিষ্ণু রূপে তুমি প্রভু করহ পালন ।
তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন ।। ইত্যাদি

* * * *

এবং দারুণ চন্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গোঙর
সর্ব অপরাধ প্রভু মোরে ক্ষমা কর ।। ইত্যাদি ।

স্তোত্রটি অকপট দৈন্যে ও আকুতিতে মধুর ।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে নাট্যসোদে গৌরাঙ্গের "জননী" আবেশ দর্শনে মোহান্তগণের স্তবটির মধ্যে — মহাশক্তির সর্বরূপের সমন্বয় হয়েছে ।

জয় জয় জগত জননি মহামায়া ।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া —

ইত্যাদি ১৬টি শ্লোকে (১৬৬ — ১৮১) রচিত 'আদ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতির চিত্রটি সুন্দর ।

অন্ত্য খন্ডেও ছয়টি বাংলা স্তোত্র আছে । যার মধ্যে শ্রী চৈতন্য স্তুতি আছে সার্বভৌমের, কুষ্ঠ রোগীর প্রতাপ রুদ্র ও রূপসনাতনের এই চারটি আর অদ্বৈত জয়দেব দুটি স্তব একটি ইন্দ্রের স্তব, অন্যটি শ্রীনিত্যানন্দ স্তুতি । এই খন্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে ষড়ভুজ মূর্তি দর্শনের পর শত শ্লোকে সার্বভৌম যে চৈতন্য স্তুতি করেছিলেন তার মর্ম বাংলাতে খন্ডখন্ড ভাবে ১৩ টি শ্লোকে করেছেন

বৃন্দাবন দাস । রাজা প্রতাপ রুদ্রের স্তবটি আছে ৫ম অধ্যায়ে ৭টি (১৯১ - ১৯৭) শ্লোকে । তার মধ্যে আর্তি ও দৈন্য সুন্দরভাবে প্রকটিত ।

"ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব জীব নাথ ।
মুঞি পাতকীরে কর শুভ দৃষ্টিপাত ।।

ত্রাহি ত্রাহি গৌরাঙ্গ সুন্দর মহাপ্রভু ।
এই কৃপা কর নাথ না ছাড়িবা কভু ॥

পঞ্চম অধ্যায়ে অদ্বৈত কর্তৃক দ্বাদশ শ্লোকে রচিত (৪৭৭ - ৪৮৮) শ্রী নিত্যানন্দ স্তুতির মধ্যে নিত্যানন্দ চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য ও রহস্যটি —"নিত্যানন্দ মূর্তি নিত্যানন্দ উৎস" "পতিত পাবন তুমি দোষ-দৃষ্টি শূন্য ।" অত্রেশ্বর পরমানন্দ" মূর্খ নীচ অধমের" উদ্ধার কর্তা ইত্যাদি সুপরিস্ফুট ।

প্রথম পালাতে গৌড়ে "দন্তে তৃণ ধরি — সাকর মল্লিক আর রূপ দুই ভাই একাদশ শ্লোকে (১০ম অধ্যায় ২৩৬ - ২৪৬) আর্ত স্তুতি করেছিলেন —

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ।
যাহার কৃপায় হৈল সর্বলোক ধন্য ॥

* * *

রাজপক্ষ করি মোরে বঞ্চনা করিলা ।
তবে মোর মনুষ্য জনম কেন দিলা ।
যে মনুষ্য জন্ম লাগি দেবে কাম্য করে ।
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু মোরে ।
এবে এই কৃপাকর অমায়া হৈয়া ।
বৃক্ষমূলে পড়ি থাকো তোর নাম লৈয়া ।
যে তোমার প্রিয় ভক্ত লওয়ায় তোমারে ।
অবশেষ পাও যেন তার ঘরে ।

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে — আদি, নদীয়া, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, উৎকল, প্রকাশ তীর্থ, বিজয়, উত্তর এই ১টি খন্ডে সম্পূর্ণ । বৃন্দাবন দাসের শ্লোক দিয়ে সুরু করেছেন কাব্য, কিন্তু সাদামাটা ভাষায় কাহিনী বর্ণিত । কথা দিশা রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে । আদি খন্ডে ব্রহ্মার একটি বিষ্ণু স্তব আছে ত্রিপদী ছন্দে । ধ্রুবপদটি এই —

ওহে দেব দৃষ্টি কর নারায়ণ ।
কলির প্রথম এই সুকর্ম করিতে না দেই
ধর্ম পথ হইল মোচন ।

স্তুতির দিক থেকে জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল অত্যন্ত দরিদ্র ।

লোচন দাস ছিলেন গৌরনাগর বাদের প্রবর্তক নরহরির শিষ্য । তাঁর রচনা শৃঙ্গার রস প্রধান । সূত্র, আদি, মধ্য ও শেষ — এই চার খন্ডে রচিত । সূত্র আসলে দেব বন্দ্র । অনেক রাগ রাগিনীর উল্লেখ আছে । ধ্রুবপদ-ও আছে । এখানে-ও গর্ভ স্তুতি আছে দেবগণের ।

জয় জয় অনন্ত অদ্বৈত সনাতন ।
জয়াচ্যুতানন্দ নিত্যানন্দ জনার্দন ॥

মামুলি পয়ার উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টার্থক কোন স্তুতি নেই । বিষয়ের বিস্তারে ও বর্ণনায় লোচন দাস নতুন কথা বলেছেন বটে, জয়ানন্দও বলেছেন — সুরের উল্লেখ, ধ্রুবপদের উল্লেখ করেছেন — কিন্তু স্তব বিশেষ কিছু করেন নি ।

(গ) পদাবলী গাথাই, বৈষ্ণব সাহিত্যে — পাদপের সুন্দরতম ফুল ও মধুরতম ফলের শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রসূতি । রস সৃষ্টিতে ও নিবিড় আনন্দ সঞ্চারণে — সঙ্গীতের যে একটি চিরন্তন ও সার্বভৌম স্বীকৃতি আছে এক কথা সর্বসম্মত । মুখ্যতঃ কথা ও সুর দিয়ে রচিত হয় গান । রসিক চিত্তে এর আস্বাদন হয় । অনেকটা সুপাচকের নৈপুণ্যে প্রস্তুত স্বাদু - সুশোভন - সুরভিত ব্যঞ্জনের মতো । আলাদা করা যায় না । তবু পন্ডিতগণ সূক্ষ্ম বিচার করেন । করে চলেছেন — কোনটা আগে — কথা না সুর এ কার আবেদন প্রবলতর — কথার না সুরের ? এগুলি জটিল তর্ক । সন্দেহ নাই যে প্রতিটি মানুষ-ই রুচি - বুদ্ধি - বোধ দিয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে এক একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা । কাজেই একটা স্থূল সমভাব গন্ডীর মধ্যে — আলগা ভাবে খানিকটা শ্রেণী বিভাগ করা গেলে-ও সর্বতোভাবে ঐক্য হয় না । কথা ও সুর — শব্দ ও অর্থের মতো — 'পার্বতী পরমেশ্বরৌ' — রূপে একাত্ম হয়ে আস্বাদিত হয় । তবে সুর ও

কথা, এদের মধ্যে — শ্রোতার শ্রবণের দিকে কোনটি অগ্রজ তা খানিকটা, হয়ত সঠিকভাবে অনুমান করা যায়। পৃথিবীর সর্ব দেশেও কালে সকল নবজাতক শিশুকে সকল মা ঘুম পাড়ানি গান করে আদর করে থাকেন। এই গানে হয়ত কিছু কথা থাকে কিন্তু শিশুর কানে যায় কেবল সুরটা — সুরের মায়া ও দোলায় স্নিগ্ধ রসে ডুবে যায় নবজাতক। বোধ হয় এ বিষয়ে সুরই জ্যেষ্ঠ ও অগ্রজ। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা বলেছিলেন —

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিন্দী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বে-আকুল মন।
বাঁশীর শবদে সো আড়লাইলো বান্ধন ॥

পরিণত বয়সে এবং শিষ্ট সমাজেও যন্ত্র সঙ্গীতের যে আকর্ষণ তা বাণীর নয়। সুরের পথ কি ?

গানকে ভারতের সমাজ জীবনে ও সাহিত্যেও একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে সুদূর কাল থেকে। সামবেদ তো গান-ই। পরবর্তী কালে যে বিদ্যাগুলি সংহত হয়েছিল — আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ ইত্যাদি তার মধ্যে গন্ধর্বদেব-ও ছিল অন্যতম। বৈষ্ণব সাহিত্য ধারায় এই গীতগুলি উত্তর কালে কেবল সঙ্গীত শিল্পরূপে নয়, সাধনায় অঙ্গ রূপে ভক্তি-সাধনার অপরিহার্য কৃত্য — রূপে গৃহীত হয়েছিল। যোগ মার্গে, তার কোন বিশেষ স্থান না থাকলে-ও জ্ঞান ও কর্মের সাধনায় গুরুত্ব না থাকলেও, ভক্তি সাধনায় গানের স্থান মুখ্য। বৈষ্ণব সাধনায় — জপের মতো ক্ষেত্র বিশেষে অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে কীর্তন — নাম কীর্তন-ই হোক, আর লীলা কীর্তন-ই হোক। অপরিহার্য সাধনা রূপে।

বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সংকীর্তন।
অন্তরঙ্গ সনে লীলা রস আস্বাদন।

এটি সাধন সংকেত ও নির্দেশ। কাজেই বৈষ্ণব সাধনাতে গানের গুরুত্ব অপরিসীম। পদাবলী — লীলা রস আস্বাদনের মুখ্য উপাদান।

বাংলা পদাবলীর মূল উৎসের অনুসন্ধানে বাঙালী কবির সংস্কৃত পদ থেকে — জয়দেবের গীত গোবিন্দ থেকে। পদাবলী সুরধুনীর একটা বড় বাঁক এসেছিল মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। বৈষ্ণব পদাবলীর কাল গত, ও বিষয়গত উভয় - দিক দিয়েই এই পরিবর্তনের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ অর্থাৎ প্রাক্ ইসলাম যুগে জয় দেবের গীত গোবিন্দ ও বড়ু চণ্ডীদাসের — শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বা শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ — এই দুই খানি পদাবলী প্রধান। আদি রসের খাতে জয়দেবের উত্তমর্ণতায় বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন লেখেন। এই কাব্যের প্রথম দিকটার স্থূলত্ব গ্রাম্যতা দুষ্ট — কিন্তু ক্রমশ এ দোষ কেটে বংশী খণ্ড ও রাধা বিরহ পর্যায় নির্মল আকাশের প্রসন্নতা দেখা দিয়েছে। মহাপ্রভু গম্ভীরাতে শ্রী রাধাকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদন করতেন যে গ্রন্থগুলির মাধ্যমে — চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি কর্ণামৃত শ্রী গীত গোবিন্দ।

স্বরূপ দামোদর সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

এই চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাস বলে চিহ্নিত করেছেন পণ্ডিতমণ্ডলী। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন শুনতেন মহাপ্রভু। পরম আনন্দ লাভের জন্য স্থূল অংশ — আদি রস আস্বাদন করতেন কি, না বংশী খণ্ড ও বিরহ অংশের রস পান করতেন অথবা বলা যায় — তাঁর দিব্যমনোলোকে রাধাকৃষ্ণ দেখিয়া কোন স্থূলতা, গ্রাম্যতাই রেখাপাত করত না। পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে বিদ্যাপতির সমাদর ছিল। তাঁর রচনার মধ্যে বয়ঃসন্ধি, অভিসারাদিতে সম্ভোগের চিত্র খুব গাঢ় রক্তবর্ণে আবার মাথুর পালাতে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের স্নিগ্ধতা অপূর্ব রং রসে মধুর। তা ছাড়া আছে বিদ্যাপতির প্রার্থনা পদ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন চৈতন্যদেব —'যঃ কৌমার হর' ইত্যাদি গাঢ় শৃঙ্গার রসের পাঠ করে নৃত্য করতেন।

মহাপ্রভুর দিব্য অনুভূতিতে সকলেই উজ্জ্বল মঙ্গল দিব্য প্রেমে অনুভূত হতো। আর তাঁর অনুভব দর্শনের মধ্যদিয়ে তার সহচর অনুচর ভক্তগণ নতুন তাৎপর্যের সন্ধান পেতেন। অধ্যাপক ড: শিবচন্দ্র লাহিড়ী একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন —

"তাঁকে (মহাপ্রভুকে) চোখে দেখে পদ লেখা হতে থাকে (ষোড়শ) শতাব্দের গোড়া থেকেই। গৌর নাগরিয় ভাবের উৎপত্তি লীলা সূচনার কাছ থেকেই দেখা যায়। চৈতন্যের ভক্তি - আর্তি - অনুপ্রাণিত ভক্ত মানুষই পদকর্তা হলেন। পরের কালে গৌড়ীয় রাধাকৃষ্ণ ভজনার রীতি পদ্ধতিতে — ভক্তিমান ব্যক্তি পদ রচনার অধিকারী হতেন। রাধাকৃষ্ণের বিশিষ্ট — সাধনা পদ্ধতিতে ভক্ত হল মহাজন, তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তিগীতি বৈষ্ণব পদাবলী। নবদ্বীপে শ্রীবাসের আঙিনাতেই কীর্তনাঙ্গ বৈষ্ণব পদাবলী ভূমিষ্ট হয়েছিল। [বৈষ্ণব পদনৈবেদ্য — গ্রন্থের বৈষ্ণব পদাবলী : শতাব্দ ভিত্তিক পরিচয় প্রবন্ধ] গৌরাঙ্গদেবের সহচর অনুচর কবিদের কণ্ঠেই — "বৈষ্ণব পদাবলীর অগ্রগণী। এই মণ্ডলীতে ছিলেন নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ মাধব - বাসুদেব ঘোষ, রামানন্দ বসু বংশীবদন, বাসুদেব দত্ত, বলরাম দাস প্রভৃতি পদকর্তা ধারায়-ই চলেন জ্ঞান দাস গোবিন্দ দাস কবিরাজ। প্রাক্ চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর পদাবলীর মধ্যে স্বাদে - গন্ধে - রূপে — বিপুল পার্থক্য দেখা দিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ বিশেষ করে শ্রীরূপ গোস্বামীর — ভক্তিরস সন্দর্ভ ও উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। বিশ্লেষণের চমৎকারিত্ব — আত্মস্থ করে নানা ভাবে পদ রচনা করেছেন উত্তর কালের মহাজন পদকর্তাগণ। পরবর্তী কালে — শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের — উদ্যোগে। বিশেষ করে নরোত্তম দাসের খেতুরীর উৎসবে পদাবলী তথা কীর্তন পদ্ধতির নানা রূপান্তর ও নবসৃষ্টি হয়। গরাণহাটি, রেনেটি, মন্দাকিনী (মনোহর শাহী) — প্রমুখ বিচিত্র ধারার সৃষ্টি হয়।

শ্রী চৈতন্যদেবকে আশ্রয় যেমন বাংলা সাহিত্যে প্রথম চরিত কাব্য রচিত হয়েছিল — তেমনি খেতুরী থেকে চৈতন্যদেবকে মূল ধরে সুরু হয় গৌরচন্দ্রিকা। গৌরাঙ্গের চরিত্র-ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের মতই — পদাবলীর বিষয় হল — ও গৌরপদ রচিত হতে থাকে। খেতুরী উৎসব থেকে নির্দিষ্ট যে যে পালা কীর্তনের অবশ্য ভূমিকা রূপে তদোচিত গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ যে ভাব রূপের লীলাকীর্তন হবে — তৎ ভাবে ভাবিত করে গৌরপদের গাহনা করার সিদ্ধান্ত।

বিখ্যাত দার্শনিক ও বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারীজী পদাবলীর তাৎপর্য ও মহিমা বিশ্লেষণে একটি অপূর্ব সুন্দর মন্তব্য করেছেন — "খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীমন মহাপ্রভুর আবির্ভাব একটি অভূতপূর্ব অচিন্তিতপূর্ব সংঘটন। তাঁহার আবির্ভাবে বাংলাদেশ জাগ্রত হইয়া উঠিল একটি নবচেতনায়। নূতন ভাষা, নূতন সঙ্গীত, নূতন ছন্দ, নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, নূতন জীবনাদর্শ। এই জাগ্রত বাঙ্গালী প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান রসপ্রস্থান। ইহার সুষ্ঠু আস্বাদন রসদর্শনে। ইহা ভারতবর্ষকে বাঙ্গালীর অমূল্য অন্নদান।

পদাবলী থেকে কয়েকটি পদ আহরণ করে —"ইহা একটি সাধন সরণি - উপাসনার পথ" — এই তত্ত্বটির উদাহরণ দিতে পারলেই আলোচনার সমাপ্তি রেখা টানা যায়। কিন্তু কাজটি কঠিন। পাঁচশত বৎসরের বিপুল পদাবলী সাহিত্যের — বহু বৈচিত্র্যের, বিবিধ রূপান্তরের নবরূপের পরিচয়, বিশেষতঃ চৈতন্যোত্তর পদসমূহের সুষ্ঠু পরিচয় দান কঠিনতর। তা আবার অতি সংক্ষেপে — সংকীর্ণ পরিসরে বলা কঠিনতম প্রয়াস, এ ব্যাপারে অপূর্ণতা, খণ্ডতা, চয়নে ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক এবং হবেও। সামান্য সংকেতে তা করার চেষ্টা করা যায়।

চৈতন্য পূর্ব প্রধান কবি জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। চৈতন্য সমসাময়িক কবি গোষ্ঠীর — অর্থাৎ নবদ্বীপের নরহরি, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ-মাধব -বাসু ঘোষ, পরমানন্দ, কানু ঘোষ বংশীবদন প্রমুখ নবদ্বীপের পদকর্তাগণ এবং সন্ন্যাসের পরে শ্রীরূপ, রঘুনাথ গোস্বামী, অনন্ত দাস, কানু দাস প্রভৃতি — কবিগণ আর চৈতন্যোত্তর কবি মণ্ডলী। শেষেরটি পঞ্চদশ থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। জয়দেব থেকে জগদ্বন্ধু পর্যন্ত কালসীমা ষোড়শ শতকের শেষ থেকে যারা মহাজন পদকর্তারূপে খ্যাত হয়েছেন জ্ঞান দাস, বৃন্দাবন দাস, গোবিন্দ দাস।

চৈতন্য পূর্ব যুগে বিষয় ছিল একটি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। চৈতন্য আবির্ভাবে — বৈষ্ণব তথা বাংলা সাহিত্যে রচিত শাখার উদ্ভবের মতো গৌরাঙ্গ জীবন চরিত নামে একটি শাখার উদ্ভব হয়েছিল। তাছাড়া প্রার্থনা পদ তো ছিলই। কাজেই মোটামুটি শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রী গৌরাঙ্গলীলা ও প্রার্থনা এই তিনটি শাখার কিছু কিছু পদের

উল্লেখ করলেই — বিপুল পদাবলীসিন্ধুর — একটি বিন্দুরও লক্ষ লক্ষাংশের একটি অস্পষ্ট আভাস মাত্র দেওয়া সম্ভব ।

(১) বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন গ্রন্থের বংশী খণ্ডের ৪টি স্তবকে রচিত কেদার রাগ ও রূপক তালে লয় এই পদটি স্পষ্ট সাধন সংকেতবাহী । দুটি স্তবক উল্লেখ করা যাক ।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি যালিনি নই কুলে ।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোঁর যে- আকুল মন ।
বাঁশীর শবদে আউলাইলোঁ রান্ধন ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা ।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে ।
তার পাএ বড়ায়ি সোঁ কৈলোঁ কোন দোষে ।
আবার ঝরএ মোর নয়নের পাণী ।
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণি ॥ ২

চৈতন্যোত্তর যুগে চণ্ডীদাসের মুখে নাম রূপ এই ধ্বনিরই নবরূপায়ণ ।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মন প্রাণ ॥

(১ক) মৈথিল কবি বিদ্যাপতি যে কৃষ্ণপদাবলী রচনা করেছেন — সেই ভাষাটি পরে ব্রজবুলি নামে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী বৃন্দাবনের দিকে স্থায়ী সরণি রচনা করে দিয়েছে । উত্তর কালের বহু পদকর্তা মহাজন এই পথে সানন্দে বিচরণ করেছেন । রাধাকৃষ্ণ লীলার সকল স্তরের রূপ বর্ণনা বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবসম্মিলনাদি — সকল ভাব ও রসের সার্থক বহুপদ রচনা করেছেন । বিদ্যাপতির মাথুর পর্যায়ের একটি পদ (জয়জয়ন্তী রাগে)

যে পণ করাছি মনে সেই সে করিব ।
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা ।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার ।
লহু লহু হাসে পহু পিরিতির সার ॥
গুরুগরবিত সঙ্গে রাই সখী সঙ্গে ।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার ।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
ঘরের যতেক সভে করে কানাকানি ।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুণি ॥

(৪খ) মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকূলে বহিয়া যায় ঢেউ ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥
দেখ সখি নবীন কান্ডারী শ্যামরায় ।
কখনা না জানে কীন বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চড়িনু কেন নায় ?
নায়্যার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়নে চাহে মোরে ।
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কান্ডারি ধরিতে চায় কোরে ॥
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হইল
পরাণ হইল পরমাদ
জ্ঞানদাস কহে সখি থির হইয়া থাক দেখি
এখন না ভাবিহ নিষাদ ॥

(১খ) এ সখি হামার দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥ ধ্রু ॥
ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বর খন্তিয়া
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘন খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া ॥
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

( ) বিদ্যাপতির আর একটি ভাব সম্মেলন পর্যায়ের আর একটি অপূর্ব অতি পরিচিত পদ ——

সখি কি পুছসি অনুভব মোয় ।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥ ১ ॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন-তিরপিত ভেল ।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনল
শ্রুতি পথে পরশ ন গেল ॥ ২ ॥
কত মধুযামিনী রভসে গমাওল
ন বুঝলি কৈসন কেল ।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয়া জুড়ল ন গেল ॥

(৩খ) শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করি যে তো সভারে ।
বন কত অতি দূর নব তৃণ কুশাংকুর
গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে ।
সখাগণ আগেপাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন
নব তৃণাংকুর আগে রাঙ্গা পায় জনি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন ।
নিকটে গোধন রাখ্য মা বল্যা শিঙ্গায় ডাক্য
ঘরে থাকি শুনি যেন রব ।
বিহি কৈল গোপ জাতি গোধন পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব ।
বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণি
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়
চরণের বাধা নৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিলা নিশ্চয় ॥

জ্ঞানদাসের যুগে কবিবৃন্দের মধ্যে অনেকেই চৈতন্যচরিত সাহিত্য রচনা করেছেন । যেমন – বৃন্দাবন দাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ অথবা কৃষ্ণচরিত কাব্য করেছেন — কৃষ্ণমঙ্গল লেখক কৃষ্ণদাস । জ্ঞানদাস নিজে সঙ্গীত কুসুমাঞ্জলি দিয়ে বিভিন্ন রস পর্যায়ের এবং বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষারীতিতে – শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা ও অর্চনা করেছেন । গোটা দুই পদ উল্লেখ করা যাক ।

(৪ক) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর ।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে ।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে
সই কি আর বলিব ।

কত বিদগ্ধ জন রস অনুমগন অনুভব কাহু না পেখ ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে ন মিলন এক ।। ৪

(২) সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেই নবদ্বীপ লীলায় নিমাই পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে বন্দিত হয়েছিলেন । অদ্বৈতাচার্যের পূজাতে এর প্রতিষ্ঠা এবং কাজীবিজয়, জগাই মাধাই উদ্ধার ইত্যাদি ঘটনায় তার প্রসিদ্ধি । তাঁর নবদ্বীপ সহচরগণ প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন অংশীদার এবং তাঁরা গৌরচরিতকে বিষয় করে অনেক পদ লিখেছেন । পরে খেতুরী উৎসবে লীলাকীর্তনের যে প্রথা রচিত হল তাতে যেকোন লীলা বা রসের কীর্তনের সময় শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করা ও তাঁর মাধ্যমে রস আস্বাদন বা তাঁর প্রসাদী রূপে শ্রবণ করার স্থায়ী রীতি হয় । এই পদগুলিকে বলা হয় তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা । গৌরচরিত ও তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা । ষোড়শ শতকের তথা মধ্যযুগের এমন বৈষ্ণব পদকর্তা বোধ হয় একজন-ও নেই, যিনি গৌরপদ রচনা না করেছেন । কাজেই নমুনাস্বরূপ একটি গৌরপদ ও একটি গৌরচন্দ্রিকা পদের উল্লেখ করা যাক । সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রথম শচীমাতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ দৃশ্যটির বর্ণনা করেছেন বলরাম দাস -——

করজোড় করি আগে মায়ের চরণযুগে
পড়িলেন দণ্ডবত হৈঞা ।
দুহাতে তুলি বুকে চুমু দিল চাঁদ মুখে
কান্দে শচী গলায় ধরিঞা ।।
ইহার লাগিয়া কত পড়াইনু ভাগবত
এ কথা কহিব আমি কায় ।
হাপুতি করিয়া মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায় ।
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি
ঘরে ঘরে যাবে ভিক্ষামাগি

জীয়ন্তে থাকিয়া মায় ইহা নাকি সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগি ॥
গোরাচান্দের বৈরাগ্যে ধরণী বিদায় মাগে
আর তাহে শচীর করুণা
কহে বলরাম দাস গোরাচান্দের সন্ন্যাস
জগভরি রহিল ঘোষণা ॥

(বৃক্ষ) আক্ষেপানুরাগের পদ ও তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা । তদুচিত গৌরচন্দ্রিকার পদকর্তা নরহরি দাস ও আক্ষেপানুরাগের পদকর্তা – মুরারি গুপ্ত । দুইজনই শ্রীগৌরাঙ্গ–সহচর ।

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা —

গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব কহন না যায় ।
বিরলে বসিয়া পহুঁ করে হায় হায় ।
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে ।
কহে মুই ঝাঁপ দিব যমুনার নীরে ॥
করিনু দারুন প্রেম আপনা আপনি ।
দুকুলে কলঙ্ক হইল না যায় পরানি ॥
এত কহি গোরাচাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস ।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস ॥

আক্ষেপানুরাগের মুরারিগুপ্তের পদটি এই —

সখিরে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও ।
জিয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কিআর বুঝাও ॥ ধ্রু ॥

নয়ান পুতলি করি লইনু মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ
পিরীতি আগুন জ্বালি সকল পুড়াইয়াছি
জাতি-কুল-শীল অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে ।
স্রোত বিথার জলে এতনু ভাসায়েছি
না করিবে কুলের কুকুরে ॥
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনা আন নাহি ভায় ।
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমন হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥

(৩) ড: বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব পদাবলীকে — শ্রীগৌরাঙ্গের প্রত্যক্ষ সহচর বাদে— জ্ঞানদাসের যুগ ও শ্রীনিবাস নরোত্তমের যুগ— এই দুভাগে ভাগ করেছেন । বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি— প্রথম পর্যায়ের মুখ্য কবি আর শ্রীনিবাস, নরোত্তমদাস ঠাকুর, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, বল্লভদাস, যদুনন্দন, রায় শেখর, শ্যামানন্দ প্রভৃতি দ্বিতীয় পর্যায়ের মুখ্য কবি । ভাষার গৌরব ছন্দঅলংকারে ঐশ্বর্য, ব্রজবুলির আধারে রচনার উন্মুখতা সমধিক ।

কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় সাধক কবি চণ্ডীদাসের অবস্থান কেন্দ্রটি কোথায় ? চণ্ডীদাস সমস্যা বাংলা মধ্যযুগের সাহিত্যে একটি কঠিন সমস্যা । বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস ইত্যাদি নানা ভণিতায় পদ পাওয়া যায় । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব কবি । মহাপ্রভু নীলাচলে যে চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন সে কোন চণ্ডীদাস — এই প্রশ্নটি তীব্র হয়ে উঠেছে । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখেছেন —

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ।।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থূল মৌল ভাবাশ্রিত পদ যে মহাপ্রভু শুনে আনন্দ পেতেন — এটা বহুসমালোচক মনে করেন না । কাজেই বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়াও অন্য কোন চণ্ডীদাসের পদ ছিল বলে মনে করেন । কিন্তু এ সংশয়ের জবাব-ও আছে যিনি জয়দেব বিদ্যাপতির কাব্য রসে মুগ্ধ হতেন — তিনি কেন বড়ুর কাব্যে বিতৃষ্ণ হবেন ? আসলে শ্রোতার মানসিকতার উপর-ই কাব্যের নির্ভর রসাস্বাদন রাধাকৃষ্ণ লীলার কোন অংশই মানব দৃষ্টির শ্লীল অশ্লীলতার আদর্শে মহাপ্রভুর দিব্য অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করত না । কাজেই এটা খুব জোরালো যুক্তি নয় । আবার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদে সদ্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দের কৌশলে শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে যখন মহাপ্রভু আসেন তখন রাত্রিকালে মুকুন্দ এই গীতটি মহাপ্রভুকে শুনিয়েছিলেন —

হা হা প্রাণ প্রিয় সখি কি না হৈল মোর ।
কানু প্রেম বিষে মোর তনু মন জয়ে ।। ধ্রু ।। ১২১
রাত্রিদিন পোড়ে মন স্বোয়াস্তি না পাঙ্ ।
যাহা গেলে কানু পাঙ্ তাহা উড়ি যাঙ্ ।। ১২২

অনেকে মনে করেন এটি চণ্ডীদাসের পদ । কিন্তু চরিতামৃতকার বলেননি, কোন ভাষ্যকারও এ কথা অর্থাৎ এটি চণ্ডীদাসের পদ বলেন নি । তবে ১৩৩১ বাংলা সনে পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সম্পূর্ণ পদটি আবিষ্কার করে প্রথম প্রকাশ করেন । (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা)। অবশ্য গানের ভাষা, আবেগ, আবেদন চণ্ডীদাসের মানসিকতার মতোই ব্যাকুল ও মধুর । যাহোক সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ ও বুধ মণ্ডলী এ নিয়ে আলোচনা করেছেন । এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে ড. ভূদেব চৌধুরী কৃত 'চণ্ডীদাস' শীর্ষক আলোচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যা হোক মহাপ্রভুর কিছু পূর্বে বা সমকালে বা পরে যে সব চণ্ডীদাস ছিলেন, সকলে

মিলেমিশে এক অপূর্ব চণ্ডীদাসে পরিণত হয়েছিলেন। অন্ততঃ পদাবলী ক্ষেত্রে, তিনি বাঙালীর বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। অনেক সুন্দর পদ আছে চণ্ডীদাসের। জ্ঞানদাসের যুগের পদকর্তাদের আগেই চণ্ডীদাসের একটি পদ উল্লেখ করা যায় — ভক্তির সাধনার রসে ভরপুর

(৩ক) যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়রে।
আনপথে যাই সে যে কানুপথে যায় রে ॥
এ ছাড় রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে ॥
এ ছার নাসিকা মুঞি কত কর বন্ধ।
তবু তো দারুন নাসা পায় তার গন্ধ ॥
যে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান ॥
ধিক রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা যে কালিয়া কানু - হয় অনুভব ॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভালভাবে আছ।
মনের মরম কথা কাহে জানি পুছ ॥

বৈষ্ণব পদসাহিত্যের মূলভাব কৃষ্ণরতি। সাধারণত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর — কৃষ্ণরতি বা ভক্তি এই পাঁচটি ধারায় প্রবাহিত। শান্ত ঐশ্বর্য প্রধান। কাজেই ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে রাগমুখে কৃষ্ণ ভজনা বলেনা। দাস্য — আমি কৃষ্ণদাস, সেবা করব। আমি কৃষ্ণের সখা বন্ধুর মত ভালবাসব। সখ্য — কানাই আমার ছেলে — বাৎসল্য ভাবে তার সেবা করব, কৃষ্ণ আমার কান্ত মধুরভাবে শৃঙ্গার রতি সব ভাব নিয়েই মহাজন পদকর্তারা পদ রচনা করেছেন। তবে সব ভাবে পদে সবার কৃতিত্ব সমান নয়। যাহোক চৈতন্য পার্ষদদের মধ্যে গৌরচন্দ্রিকা পদে একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এবারে বাৎসল্য রসের আর একটি পদ দিয়ে এই পর্যায় শেষ করা যাক। পদটি গোষ্ঠ-লীলার নিদর্শন। পদটি চৈতন্যসহচর বলরাম দাসের — যশোদা মায়ের জবানী —

ষোড়শ শতকের পরবর্তী পদাবলীর যুগকে ড: বিমানবিহারী বলেছেন শ্রীনিবাস নরোত্তমের যুগ। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দ দাস কবিরাজ। এছাড়াও আছে রামচন্দ্র কবিয়াল, গোবিন্দ চক্রবর্তী, নরোত্তম, বল্লভদাস, বসন্ত রায়, যদুনন্দন চক্রবর্তী, রামগোপাল, শ্যামানন্দ প্রমুখ মহাজন। গৌরপাদপদ্মে ও রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনায় থেকে গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত পান্ডিত্যপূর্ণ ও রসগর্ভ রচনা। ব্রজবুলি ও বাংলা উভয়বিধ রীতিতেই গোবিন্দদাস রচনা করেছেন। তাঁর গৌরবিষয়ক পদের একটি উদাহরণ :

(৫ক) নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব ॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনি তীরে উজোর ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝংকরু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর ॥
অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।

সব পর্যায়ের পদরচনায় গোবিন্দ দাসের কৃতিত্ব উচ্চপর্যায়ে অভিসার পর্যায়ে মহাজন পদকর্তাদের মধ্যে তিনি সর্বাগ্রগণ্য। বিশেষত: সাধনমার্গের ঘোর একাগ্র ব্যঞ্জনায় তা তুলনীয় :

(৫খ) কণ্টক গারি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি ।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥
মাধব, তুয়া অভিসার লাগি ।
গুরুতর পথ গমন ঠমি মাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু কামিনী
তিমির পয়ানক আশে ।
করকংকন পণ ফণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে ॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন দুখই কহ আন ।
পরিজন বচনে সুপঠ সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ

এবার প্রার্থনা পর্যায়ের পদ । রাধাকৃষ্ণ মাধুর্য বর্ণনা নয় । সরাসরি ভক্ত হৃদয়ের আকুল আকুতি ও অসহায়তার বিবরণ দিয়ে কৃপা প্রার্থনা । এই পর্যায়ে বিদ্যাপতির স্থান সর্বোচ্চ । দুটি নিদর্শণ দেওয়া যাক –

(৬ক) তীতল সৈকতে বারি বিন্দু সম
সুরমিত রমনি সমাজে ।
তোহে বিসরি মন তাহে সমাপলুঁ
অব মঝু হত কোন কাজে ॥
মাধব পরিণাম নিরাশা ।
তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতএতোহরি বিশোবাসা ॥

আধন জনম হম নিন্দে গোঙায়নুঁ
জয়া শিশু কতদিন গেলা ।
নিধু বনে রমণী পদে মাতনুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুরানন মরি মরি জাওত
ন তুয়া আদি অবসানা ।
তোহে জামি যুন তোহে নামাওত
সাগর লহত সমানা ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ শাসন ভয়
তুয়া বিনা গতি নাহি আয়া ।
আদি অনাদি নাথ কহায়সি
ভবতারণ ভার তো হাবা ॥

(৬খ) মাধব বহুত মিনতি করি তোয় ।
দেই তুলসীতিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয় ॥ ধ্রু ॥
গণই তো দোষ গুণলেশ না পাওঠে
যব তুই করবি বিচার
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগবাহির নহু মুঞি ছার ।
কি এ মানুষ পশু পাখিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ ।
জনম বিশ্বানে পড়াপড়ি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ।
গুণই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু ।
তুয়া পদ পল্লব করি অবলাপ
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

সর্বদেশ ও কালে একটি অস্পষ্ট বিশ্বাস মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে ছিল — এখনও আছে। যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মূলে আছে একটি সচেতন মহাশক্তির ইচ্ছা ও আবেগ। সর্বনাশা বন্যা সৃষ্টি করেন যিনি তাঁরই দান মাঠভরা ফসল। তিনি মহাশক্তিশালী ভয়ংকর। এই ভীতি সৃষ্টি পরে আরও সমুন্নত জীবন-চর্চার এমন প্রীতি চেতনা। দেবতা - যিনি দেন তিনি যেমন ভয়ের নয় প্রীতির-ও দেবতা। দেবতার স্তুতি রইল, কিন্তু সুরটা রংটা গেল বদলে। প্রাণসর্বস্ব স্তরে ভীতি ও ভয়ের একচ্ছত্র প্রাধান্য। তারপর মন-বুদ্ধি-বোধির উদ্বোধনে এল প্রীতি। ভীতির ভাজন ভয়ংকর নয়। প্রীতির ভাজন প্রিয় জন তিনি। দেব-কল্পনার এই দুই মুখ্য আধার। উপরের স্তরের প্রীতি ও নীচের স্তরের ভীতি এই দুইটির আন্দোলনে বিরোধে মিলনে সংস্পর্শে সমন্বয়ে নতুন রূপ তৈরী হল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম উষার বৈষ্ণব সাহিত্যে একটি চমৎকার ঘটনা ঘটেছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত গীত-গোবিন্দের উপর বর্ষিত হয়েছিল বাঙালীর রসিক চিত্তে এক মেঘমেদুর অম্বরে উঠেছিল আহ্বান ধ্বনি —

যদি হরিস্মরণে সরসংমনো
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্॥

লোকহৃদয় মেনে সাড়া দিয়েছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস। তাঁর রাধার কণ্ঠে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা ছড়িয়ে পড়েছিল আকাশে-বাতাসে —

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কাহ্নিনী নই কুলে।

সেই বাঁশীর সুর দিয়ে সুরু হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের আগমনী গাথা। অতঃপর উপর থেকে নেমেছিল অনুবাদ সাহিত্যের ধারা — আর নীচ থেকে উপরে মাথা তুলেছিল মঙ্গল সাহিত্যের বহুশাখা বনস্পতি তারপর "বাঙ্গালীর হিয়া অমিয়া মথিয়া নিমাই ধরিল কায়।" — বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতিতে জীবনে সমাজে এল এক বিপুল বিস্ফোরণ, আবেগের অভিনব ভাব বন্যায় অভিঘাতে দেখা দিল নতুন প্রশাখা — গৌর-কথা। কৃষ্ণকথার পাশাপাশি এল গৌরচরিত কথা। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে

পদাবলীতে বরাবর এল গৌর বিষয়ক পদ – এল গৌরচন্দ্রিকা । মঙ্গলকাব্য ধারাগুলির গতানুগতিক কঠোরতার মধ্যে এল নব প্রেম চেতনার স্নিগ্ধতা । অনুবাদের মধ্যেও এল মহাপ্রভুর অমিয়-চরিতের কান্তকোমল দিব্য জ্যোতি । অন্য ধারাগুলি – মঙ্গলকাব্য-অনুবাদটির স্রোত মন্থর হয়ে গেল কিন্তু পদাবলী - রাধাকৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা দুই দিকেই নব নব মাধুর্যে সৌন্দর্যে – ততোধিক সাধনসঙ্গীত রূপে অভিনব গৌরবে প্রবাহিত হল – অতিক্রম করে মধ্যযুগের সীমা সাহিত্যে সংস্কৃতিতে জীবনে ধর্মে আজও, এই আধুনিক যুগেও বৈষ্ণব পদাবলীর পুণ্যপ্রবাহ বেগবান নির্মল, অমৃত রসে স্বাদু তার প্রতিটি অঞ্জলি । অষ্টাদশ শতকে-ও বিশেষ করে রাম-প্রসাদের কণ্ঠে যে মাতৃবন্দনের যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল তাও বহুলাংশে বৈষ্ণব রস পদাবলীর অভিঘাতে । যশোদার কৃষ্ণবাৎসল্যের প্রতিফলিত রূপই তো মেনকার গৌরী প্রীতি, অনুরাগ স্নেহ নির্ঝর । উত্তরকালের সঙ্গীতপ্রবাহে বিশেষ করে ভক্তি-সঙ্গীতের অন্ত রতম প্রকাশ ধারাটি এই পদাবলী সোমুখ থেকেই উৎসারিত – এ কথা বলার মধ্যে কোন অত্যুক্তি আছে বলে মনে হয় না । আর এ-কথাও অনস্বীকার্য যে এই সঙ্গীত ধারার মর্মমূলে আছে বিভিন্ন রূপে ও বর্ণে রচিত ভক্তি-নম্র হৃদয়ের একান্ত নিবেদন স্তোত্র-স্তব, স্তুতি-নুতির অঞ্জলি ।

চতুর্থ অধ্যায়

সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও উনবিংশ শতাব্দীর ভক্তি-গীতিকাব্য

চতুর্থ অধ্যায়

সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও উনবিংশ শতাব্দীর ভক্তি গীতিকাব্য

[ক]

"প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মোটামুটি ধর্মাশ্রিত ও আধিদৈবিক এবং গান বাহিত ছিল। এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল দেবতার অনুগ্রহ - নিগ্রহ কাহিনীর মধ্য দিয়া সুরে তালে গল্প রসের যোগান দেওয়া এবং সনাতন পৌরাণিক গার্হস্থ্য ধর্মনিষ্ঠ জীবনের আদর্শ আবৃত্তি। এই গতানুগতিকতা খানিকটা ভঙ্গ হইল ষোড়শ শতাব্দে বৈষ্ণব গীতি-কবিতায় এবং চৈতন্যচরিত কাব্যে। এ কাব্যের বিষয় দেবদেবী নয়। সমসাময়িক এক মানুষ।" বলেছেন আচার্য সুকুমার সেন। [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ] অর্থাৎ দৈবী অনুগ্রহ - নিগ্রহ - নির্ভর সুদূর শূন্যেস্থিত কল্পভূমি থেকে মানব মহিমার বাস্তব ভূমিতে অবতরণ : — মানুষের মধ্যেই বিশ্ব - রহস্যের সমগ্র শক্তির উজ্জীবন, উদ্বোধন ও আস্বাদন এবং জীবনের অভিব্যক্তি ও বিকাশ সম্ভব — এটাই পরিবর্তিত প্রগতি পথের একমাত্র আদর্শ ও প্রতিশ্রুতি। মনুষ্যত্বের পূর্ণতা লাভ ও প্রতিষ্ঠাই হয়ে উঠেছিল, ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানবের একমাত্র লক্ষ্য। এর বীজ উপ্ত হয়েছিল মধ্যযুগের বৈষ্ণব ভাবনায় —

কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা
নর বপু তাঁহার স্বরূপ।

আরো উচ্চকণ্ঠে ও স্পষ্ট ভাষায় উদ্‌ঘোষিত হয়েছিল কথাটি সহজিয়া সাধকের উপলব্ধিতে —

শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

[খ]

নানা ঘটনা - দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে ছুটে চলে জগৎ ও জীবন প্রবাহ — তার খানিকটা ছন্দিত প্রতিবিম্বন পড়ে সাহিত্যে। সমাজের তথা রাষ্ট্রের যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে চলে মানুষ যুগে যুগে — তার ভাব - ভাবনার স্ফুরণগুলি বহন করে

সাহিত্য। মুসলিম আধিপত্যের অবসানে ও ইংরাজ রাজশক্তির সমুত্থানের মধ্যে উনবিংশ শতকে আধুনিক যুগের শুভ যাত্রা সুরু হল। পত্তন হল ইংরাজী শিক্ষার। কোম্পানীর প্রবর্তনায় প্রতিষ্ঠিত হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ একদিকে, অপর দিকে মিশনারী পাদ্রীরা গড়ে তুললেন শ্রীরামপুর মিশন। স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, প্রসার হল স্ত্রী শিক্ষার। হিন্দুদের নানা সামাজিক ব্যাধির যুক্তি-সম্মত নিরাময়ের প্রয়াস হল— সতীদাহ প্রথা হল অসিদ্ধ ও নিষিদ্ধ। সিদ্ধ হল বিধবা বিবাহ। নব জাগরণের চিন্তার মুক্তি ও তার কর্মরূপ দিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। পদ্য রীতির স্থলে গড়ে উঠল বাংলা গদ্যরীতি। প্রতিষ্ঠিত হল মুদ্রন যন্ত্র, স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকাদির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণাদির-ও প্রকাশনা সুরু হল এবং অনুরূপ ধারায় গড়ে উঠল গদ্য সাহিত্য। খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজা রামমোহন বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। সংবাদপত্রের প্রকাশনায় — গদ্যের অগ্রগতি হ'ল দ্রুত ও দৃঢ়পদক্ষেপে। মিশনারিদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী নেতৃবর্গ-ও সমান তালে সংবাদ-পত্রাদি প্রকাশ করতে লাগলেন আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ইংরাজের নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ও সেই ধারায় বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করতে প্রয়াস। অবশ্য এই ধারাটি সুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই। রুশ দেশীয় প্রতিভা হেরাশিম লেবেডেফ বেঙ্গলী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে নাটক মঞ্চস্থ করেন ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে। অনেক সখের নাট্যমঞ্চ গড়ে উঠেছিল বাঙলা ধনী-বণিক ও জমিদারদের আগ্রহে। তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বেলগাছিয়া নাট্যশালা। কারণ এই সূত্রেই মাইকেল মধুসূদন বাংলা রচনায় আগ্রহী হন এবং এখানেই ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শর্মিষ্ঠা নাটক মঞ্চস্থ হয়।

[গ]

এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় যে মানুষের সমাজে এবং কাজেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে-ও, যে সব পরিবর্তন ও নবীকরণ হয়, তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়,

কোন অমূল তরু-ও নয়। একটা ধারাবাহিকতা থাকেই এবং নতুন বাঁক নেবার মুখে — পুরাণো ও নতুনের মধ্যে প্রথমটা একটা সংঘর্ষ ও পরে সমন্বয় সাধিত হয়। পুরাণো ও নতুন দুটি ধারার সংঘর্ষের সময়ে পুরাণো ধারার মধ্যে যে সারবস্তু থাকে — তা নূতন ধারার মধ্যে সমর্পিত হয়ে — কখনো নতুন সাজে ও নামে বেঁচে থাকে, আর অসার অংশ — আপনি শুকিয়ে ঝরে পড়ে শুকনো মুকুলের মতো।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য — মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ ও বৈষ্ণব সাহিত্য এই তিন ধারায় বহমান ছিল। তবে সবগুলির আকার প্রকার ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য এক রকম ছিল না। বৈষ্ণব সাহিত্য — পদাবলী ও চৈতন্যোত্তর চরিত শাখা প্রবলতর ছিল। বিশেষতঃ বৈষ্ণব পদাবলী নিত্যস্রোতা গঙ্গা ধারার মতো বেগে ও বৈচিত্র্যে কালতিশায়ী। উনবিংশ শতক তো বটেই এই বিংশ শতকের অন্ত্য দশকে-ও বৈষ্ণব পদাবলী সাধন সঙ্গীত হিসাবে অর্থাৎ ভক্তি সাহিত্যের মুখ্য আধার রূপে সগৌরবে সুস্থিত।

মঙ্গলকাব্যের ধারা পুরাণো ধারা ক্রমে প্রক্ষীণ হয়ে পড়েছিল — নতুন নতুন উৎস থেকে খানিকটা জলের যোগান এসে কোন রকমে তির তির করে চলতো। গঙ্গা ভাগীরথীর বা ব্রহ্মপুত্র থেকে প্রবল জলরাশি যেমন সমুদ্র সান্নিকটে — সুন্দর বনের কাছাকাছি এসে বহু ছোট ছোট খাড়িতে ভাগ হয়ে সমুদ্রে পড়ে — তেমনি বড় শাখাগুলি ভেঙে নানা প্রকীর্ণ ধারার মঙ্গল কাব্যে পরিণত হয়েছিল অর্থাৎ চণ্ডী-মনসা-ধর্ম দেবতাকে ছেড়ে মুখ্যতঃ ছোট ছোট দেবদেবী — কমলা - ষষ্ঠী - শীতলা সারদা (সরস্বতী), গঙ্গা, সূর্য প্রমুখ দেবদেবীর মহিমা কীর্তন করে — কমলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, সারদা মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গোঁসানী মঙ্গল, ব্যাঘ্রদেবতা বায়ুমঙ্গলাদি — নানা ধারায় বাহিত হয়েছিল। লোককথার মিশ্রণে নানা ব্রতকথাদির সঙ্গে সংযুক্তি ছিল তার। অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-ই শেষ সার্থক রচনা। অবশ্য উনিশ শতকে-ও কিছু কিছু মঙ্গল কাব্য রচনার সন্ধান পাওয়া যায় — যেমন জগন্ময় মিত্রের মনসা মঙ্গল (১৮৪৪), দ্বিজ কালীপ্রসন্নের মনসামঙ্গল (১৮৬০) দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিনী (১৮২৩) ইত্যাদি।

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। বিষয় যাই হোক — বাঙালীরা — বাঙালী কবি সমাজ 'মঙ্গল' কথাটি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থনামা ও কাব্যনামাতে 'মঙ্গল' শব্দটি বার বার উচ্চারণ করেছেন কারণ এই শতকের-ও যেমন সারদামঙ্গল, বর্ষামঙ্গল, ঋতুমঙ্গল নাম সুলভ।

অনুবাদ শাখার ইতিহাস অনুরূপ। সাহিত্য সৃষ্টিতে পদ্য রীতি থেকে গদ্য রীতির প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থের অনুবাদে উত্তরকালে এই গদ্যানুবাদ পদ্ধতিটি জনপ্রিয় হয়েছিল। বিদ্যাসাগর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের গদ্যানুবাদে হস্তক্ষেপ করেন এবং পরে বর্ধমান রাজসভা থেকে মহাভারতে অনুবাদ হয়েছে। বিংশ শতকে-ও এই ধারাটি জনপ্রিয় হয়েছিল — হেমচন্দ্রের রামায়ণ এবং রাজশেখর বসু রচিত রামায়ণ ও মহাভারত উল্লেখযোগ্য। পদ্যে রামায়ণ রচনা করে ছিলেন পিতাপুত্র — জগৎ রাম ও রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৯২ আর বঙ্গনন্দন গোস্বামী রাম রসায়ণ (১৮৩৪) রচনা করেন। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা এই যে পদ্য রীতিতে-ই রাজকৃষ্ণ রায় — সপ্তকাণ্ড রামায়ণ (১৮৭৭ - ৮৫) ও মহাভারত (১৮৮৬ - ৯৩) অনুবাদ করেছিলেন।

[ঘ]

ইতিহাসের ধারাটি অনুসরণ করা যাক। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই — বস্তুতঃ ইংরেজ শাসনের পত্তন হল। এটির নাম কোম্পানীর অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমল। কোম্পানীর আমল শেষ হয় এক শত বৎসর পরে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে। মহারাণীর ঘোষণাতে ভারত সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর ক্রমশঃ ইংরাজী শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার পরিচয় পূর্বে আলোচ্য অধ্যায়ে [খ] অংশে সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়েছে।

কিন্তু তার সমান্তরালে — কলিকাতার নব্য ইংরাজী শিল্প - সংস্কৃতির উজ্জ্বল আলোকের পশ্চাতে যে আর একটি প্রাণবান পুরোণো ধারা সুপ্তালোকিত অঞ্চলে

নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যমান ও বহমান ছিল — বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার স্থান ও দান বিশেষতঃ বিবর্তন ও বিকাশের মুখে নিতান্ত নগণ্য ছিল না। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ ও ভাষায় তার বিবরণ দেওয়া যাক।

"অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কলকাতায় ইংরেজ শাসন শুরু হয়েছে, মধ্যযুগীয় গ্রামীণ জীবন ক্রমে ক্রমে নাগরিকতার লোভ লোলুপতায় আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের নিস্তরঙ্গ পরিবেশ ছেড়ে কলিতীর্থ কলকাতায় হাজির হল। তখন-ও গ্রাম - গ্রামান্তরে আখড়ায় আখড়ায় কীর্তনের গানাগানের মিলন - অভিসার - মাথুর - ভাব সম্মেলনের পদের হাজারবার আবৃত্তি চলেছে বাউলেরা একতারা বাজিয়ে পায়ে ঘুঙুরের চঞ্চল বোল তুলে বাঁয়াতে ঘা মেরে পরমগুরু সাঁইর কাছে আর্তি জানাচ্ছে, সহজিয়া বৈষ্ণব আউলিয়া সাঁইপন্থী কর্তাভজারা রহস্যময় প্রতীকী গানে দেহকে মন্থন করে বৈদেহী রসানন্দে মগগুল হয়ে আছে। * * নব যুগাদর্শ অভিনবত্বের ঘন্টাধ্বনি আরম্ভ করলে-ও পুরাতন ভাবাদর্শে লালিত কবি ও শ্রোতারদল তখন-ও তার তাৎপর্য ধরতে পারেনি। তখন কলকাতাকে ঘিরে কবিগান, আখড়াই, টপ্পা মালসী (ভবানী বিষয়ক) প্রভৃতি সঙ্গীতাশ্রয়ী কাব্য কবিতা জনচিত্ত রঞ্জনে ব্যস্ত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ধরণের সঙ্গীত কলা সাধারণ - অসাধারণ সমস্ত স্তরের বাঙালীকেই মাতিয়ে তুলেছিল।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খন্ড প্রথম অধ্যায়, ড: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

[৬]

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধ থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত — এক শত বৎসর কাল ছিল বাঙালীর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অনিশ্চয়তার যুগ। এই সময়ে রাজ্য শাসন নীতিও ছিল শিথিল ও সংশয়াকুল। বণিক বৃত্তি ও রাজ্য শাসন — এই দুই বিপরীত মনোভাবের দ্বারা শাসক শ্রেণীর কর্মপদ্ধতি ছিল অনেকটা দ্বিধা গ্রস্ত। সাহিত্য ক্ষেত্রে-ও এই দ্বিমুখিতার প্রভাব পড়েছিল।

"ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল হইতে গুপ্ত কবির মৃত্যু কাল পর্যন্ত শত বৎসর কালকে বাংলা

সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাত্রিকাল বলিয়া অভিহিত করা যায় ; যদিও ইহার দ্বিতীয়ার্ধে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের উৎসাহ, বাংলা গদ্য প্রচেষ্টা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতির দ্বারা উদয় দিগ্‌বলয়ে নূতন দিনের পূর্বাভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল । * * * এই শত বৎসরের রাত্রির স্তিমিতালোকের মধ্যে ছোট বড় বিভিন্ন নক্ষত্র পুঞ্জের ক্ষীণ জ্যোতি লইয়া বাঙ্গালা জন-সাহিত্য গগনে যাহারা ভিড় জমাইয়া ছিল, বর্তমান দিনের প্রখরালোকে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেলেও সে রাত্রিতে তাহাদের দাম ও দান কম ছিল না । কবি, কীর্তন , ঢপ , পাঁচালী, যাত্রা, খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই, ঝুমুর, টপ্পা প্রভৃতির বিপুল ও বিচিত্র আয়োজনে সমসাময়িক বাঙ্গালী জনসমাজের মনের ক্ষুধা ও রসের তৃষ্ণা পরিপূর্ণ ভাবেই হয়তো মিটিয়া ছিল । তারপর নূতন আশা - আকাঙ্ক্ষা ও জীবন ভঙ্গী লইয়া যখন নবযুগের আবির্ভাব হইল, তখন সূর্যোদয়ে নক্ষত্র পুঞ্জের মতো অকস্মাৎ তাহারা যেন দিগন্তে মিলাইয়া গেল ।" [দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী — ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী]

যাহোক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্র ও রসিক সমালোচক উভয়ের কাছেই এই যুগটির একটি বিশেষ মূল্য বহন করে । উনবিংশ শতকের ইংরাজী শিক্ষা ও নব যুগের অভ্যুদয়ে — এই যুগটি অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত যুগটি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল । একটি ধারাকে বলা যায় ইংরাজী প্রভাব বর্জিত বাংলা সাহিত্য — অপরটি ইংরাজী প্রভাবপুষ্ট বাংলা সাহিত্য । ক্ষয়িষ্ণু পুরাণো ধারা ও উদীয়মান নতুন সাহিত্যের অসম প্রতিযোগিতার ফল সুবিদিত ও সুনিশ্চিত । ইংরাজী প্রভাব বর্জিত ধারাটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেল । এই লুপ্ত হওয়া কিন্তু ফুরিয়ে যাওয়া নয় । নবীন ধারার মধ্যে আধুনিক যুগ প্রবাহের মধ্যে আত্ম উৎসর্জন । ভক্তি ভাগীরথীর নিত্য তোয়া ধারার মতো বৈষ্ণব পদাবলীর কথা পূর্বে বলা হয়েছে । কিন্তু ভক্তিভাব বাহী অন্যান্য প্রস্রবণগুলি কবি, পাঁচালী, আখড়াই, যাত্রা ঢপ এইগুলিও নতুন ভাবে, রঙ্গমঞ্চের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ও যাত্রাগানের আসরে নব নব রূপে উনবিংশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে তো বটেই বিংশ শতকের প্রথমার্ধেও অনেকখানি অর্থবহ ছিল । সে কথা যথাস্থানে — আলোচিত হবে । এখন কবি-পাঁচালী ইত্যাদি ইংরাজী প্রভাব বর্জিত

ধারাটির উদ্ভব, বিকাশে পরিচয় দেওয়া যাক, — যেটিকে — ভারত চন্দ্রের মৃত্যু কাল থেকে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু কাল পর্যন্ত মোটামুটি শত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের রাত্রিকালের সাহিত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে ।

[চ]

এই সময়কার ইংরাজী প্রভাব বর্জিত বাংলা সাহিত্যের মুখ্য, তথা একমাত্র আধার ও আশ্রয় ছিল সঙ্গীত । এই জন্য কেউ কেউ এই কালকে গানের যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন । যেমন রসভান্ডার গ্রন্থের ভূমিকায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন — "বাংলা সাহিত্যের ক্রম বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ লইয়া এমন একটা সময় গিয়াছে যাহাকে গানের যুগ বলা যাইতে পারে । নিধুবাবু ও শ্রীধর কথকের আদিরসাত্মক সঙ্গীত, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতির কবির গান, দাশরথি রায়ের পাঁচালী — এই সময়ে রচিত হয় ।"

এই গীতি - প্রধান বা গীত সর্বস্ব ধারার নেতৃত্বে ছিল কবিওয়ালারা তাই অনেকে এই যুগকে কবিওয়ালাদের যুগ বলেও অভিহিত করেছেন । ড: সুশীল কুমার দে Bengali Literature in the 19th Century — গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন "The interregumn till the emergence of the new literature was broken chiefly if not wholely by the Kaviwallas."

জমিদার ও ধনী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষণাতে এই জনসাহিত্য ধারার — মুখ্যত কবিগানের প্রসার ঘটেছিল । তৎকালের মুখ্য নগরসমূহ — কাসিম বাজার, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া হয়ে গঙ্গার ধারাপথে হুগলী, চুঁচুড়া প্রমুখ স্থান হয়ে অগ্রসর হয়ে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইংরেজের নতুন গড়া শহর কলকাতায় । লোকসাহিত্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একটু সুন্দর মন্তব্য করেছেন ——" ইংরাজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন

রাজসভা ছিল না, পুরাতণ আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।"

যাহোক — এই শত বৎসরের ইংরাজী প্রভাব বর্জিত জনসাহিত্য শাখার মুখ্য প্রতিনিধিত্ব করেছে — কবিগান আখড়াই ও পাঁচালী এই তিনটি ধারা। এদের ইতিবৃত্ত ও পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক।

[ছ]

কবিগান কখন কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়েছিল। কবি গান নাম হ'ল কেন, কারা প্রাচীন ও প্রধান কবি এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। গুপ্ত কবি থেকে শুরু করে বহু পন্ডিত, গবেষক, সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ আলোচনা করেছেন। কাজেই এখানে পুন আলোচনা অনাবশ্যক। ড: সুশীল কুমার দে মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সূচক মন্তব্যটি উল্লেখ করে কবিগানের অন্যান্য পরিচয় বিশেষ করে ভক্তি সাহিত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত গানগুলির বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা করা যাক।

কবিগানের উদ্ভব ও বিকাশের কাল সম্বন্ধে অধ্যাপক ড: দে History of the Bengali Literature in the 19th Century গ্রন্থে লিখেছেন —
"The existence of Kavi songs may be traced to the beginning of the 18th Century or even beyond it to the 17th, but most flourishing period of the Kaviwallas was between 1760 and 1830."

কবি গানের মুখ্য অঙ্গ চারটি। ক্রম এই প্রকার — দেবী বিষয়ক গান, সখী সংবাদ, বিরহ, খেউর-লহর চাপান — কাটান পদ্ধতিতে কবির লড়াই হতো। প্রথম তিনটি অংশ বাঁধা পদ্ধতি ছিল গান রচনায় — চিতেন, পরেন, পরচিতেন, ফুকা,

মেলতা, মহরা — এই ভাবে । দেবীবিষয়ক গান -- মানসী পরৎ কালে এর বিষয় হতো আগমনী বা সপ্তমী এবং নবমী বা বিজয়া । সখী সংবাদ কৃষ্ণ বিষয়ক গান । এই দুটি ভক্তি সাহিত্যের অঙ্গ । বিরহ — নরনারীর প্রেম বিরহের কথা । আর চতুর্থটি অতি স্থূল — অশ্লীল পালাগান । কবিওয়ালার সংখ্যা অনেক । সংবাদ প্রভাকর থেকে শুরু করে বহু গ্রন্থে — যেমন কবিওয়ালাদের গীত সংগ্রহ, প্রাচীন কবি সংগ্রহ, গুপ্ত রত্নোদ্ধার, প্রাচীন ওস্তাদি কবিগান, বাঙ্গালীর গান, রসগ্রন্থাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে — বহু গান সংকলিত হয়েছে । প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদের মধ্যে — গোঁদলা পুল, রাসু নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী, রাম বসু, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, কেষ্টা মুচি, লালু নন্দলাল , ঠাকুর দাস চক্রবর্তী, গদাধর মুখোপাধ্যায়, এন্টনী ফিরিঙ্গি, ভোলাময়রা, ভবানী বেনে নবাই ঠাকুর, যজ্ঞেশ্বরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । ঈশ্বর গুপ্তও নিজেও একজন কবিওয়ালা ছিলেন ।

এই লড়াকু কবির গানের সাধারণ নাম ছিল দাড়া কবি । দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান করার জন্য নয়, একটি বিশেষ দাঁড়া বা পদ্ধতি (স্টান্ডার্ড) অনুসারে করার জন্য । হার জিতের বিচারও হোতো বিষয়ের সঙ্গে সুর তাল ইত্যাদি মিলিয়ে ।

ভবানী বিষয়ক (বা গুরুদেবের গান) এবং সখী সংবাদ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক গান — এই দুটি শাখা ভক্তি রসাশ্রিত । গানগুলিও মুখ্যতঃ ভবানী বিষয়ক গান মাত্রেই স্তোত্র ধর্মী । সখী সংবাদের — মধ্যেও বহু গানে আর্তি ও আবেদন — অকৃত্রিম ও নিবিড় ।

দেবী বিষয়ক গীতের দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক ——

(ক) পথের সম্বল ছিল যাদের তারা ওগো তারা মা ।
তারা পায় ছানা সব অনায়াসে ।
আছি আমি পারে বসে
অপার সিন্ধু জলে ।

তারা ভাবছি রূপ ভবের কূপে
ডাকছি দুর্গা দুর্গা বলে
দুর্গা তোমার দয়া হলে,
পার হয়ে যাই ভবে ॥ (হরু ঠাকুর)

(খ) জয়া যোগেন্দ্র জায়া, মহামায়া
মহিমা অসীম তোমার ।
একবার দুর্গা দুর্গা বলে যে ডাকে মা তোমায়
তুমি কর তার ভব সিন্ধু পার ।
মা, তাই শুনে এ ভবের কূলে
ডাকি দুর্গা দুর্গা বলে, বিপদ কালে
ডাকি দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা ।
তব সন্তানের মুখ চাইলে মে মা,
আমায় দয়া করলে না মা ,
পাষাণে প্রাণ - বাঁধলি উমা
মায়ের ধর্ম এই কি মা ?
অতি কুমতি কুপুত্র বলে
আপনি-ও কুমাতা হলে, আমার কপালে
তোমার জন্ম যেমন পাষাণকুলে, ধর্ম তেমনি রেখেছ
দয়াময়ি, আজ আমায় দয়া করবে কি মা
কোন কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ । (এন্টনি ফিরিঙ্গি)

এ সম্বন্ধে – ড: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুন্দর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য —— "শুধু পড়ে গেলেই এই ছন্দ হারা ছন্দছাড়া পরিপাট্য হীন পঙ্‌ক্তিগুলি নিরাভরণ অনলংকৃত রূপেই শ্রোতার মনে সায়াহ্নের উদাসীন বৈরাগ্য জাগিয়ে তোলে । এর মধ্যে তত্ত্বের চেয়ে বেদনা মিশ্রিত রয়েছে যে এর মধ্যে সাধক ও শ্রোতা যেন নিজেরই আবেগের প্রতিধ্বনি শুনতে পায় ।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত চতুর্থ খন্ড ।)

কবিগানের সখী সংবাদের মূল বিষয় কৃষ্ণের মথুরা গমনের পরে সখীরা দৌত্য। খুব রসাল - বিদ্রূপ ব্যঙ্গোক্তির সঙ্গে রাধার সখীর কৃষ্ণের প্রতি ভর্ৎসনা এবং তা নিয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর। এই ঝাঁঝালো বক্র অভিযোগ - অনুযোগের মধ্যে — কোন কোন ক্ষেত্রে ভক্তির আর্তিও ফুটে ওঠে। স্মরণ যোগ্য যে শীর্ষক সখী সংবাদ হলেও আসলে গোপী বৃন্দাবন লীলাই — এই অংশে গীত হয়।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক কবিয়াল রাম বসুর গীত থেকে।

(ক) ওহে এ কালো উজ্জ্বল বরণ তুমি কোথা পেলে,
বিরলে বিধি কি নির্মিলে ॥

যে বলেছে বলুক কালো
আমার নয়নে লেগেছে ভালো
বামা হলে শ্যামা বলতাম তোমায়
পূজিতাম জবা বিল্বদলে।

আরো তো আছে হে অনেক কালো
এ কালো নহে তেমন
জগতের মনরঞ্জন।

না মেনে গোকুলে কুলের বাধা
সাধে কি শরণ লয়েছে রাধা,
জনমের মতো ঐ কালো চরণে
বিকায়েছে বিনি মূলে ॥

ওহে শ্যাম, কালো শব্দে কহে কুৎসিত
আমার এই তো জ্ঞান ছিল।
সে কালোর কালোত্ব গেল হে কৃষ্ণ
তোমারে হেরে কালো
এখন বুঝিলাম কালোরো ধড়ো

সুন্দর নাহিক আর ।
কালো রূপ জগতের সার ।
ত্রিলোকে এমন আর নাহিক হেরি
ও রূপের তুলনা কি দিব হরি ।
কালো রূপে আলো করেছে সদা
মোহিত হয়েছে সকলে ॥
এক কালো জানি কোকিল
আর ভ্রমরার কালো বরণ ।
আর কালো আছে জলকালিন্দীর
কালো তো তমাল বন ।
আর কালো দেখ নবীন নীরদ
ছিল যে দৃষ্টান্ত স্থল কালো তো নীলকমল
সে কালোর কালোত্ব দেখেছে সবে ।
প্রেমোদয়, অশ্রু হয় করে বা ভেবে ।
তোমার মতন চিকন কালো
না দেখি ভুবন মন্ডলে ॥ (বাঙালীর গান)

কবি সঙ্গীতের অপর দুই অঙ্গ বিরহ ও খেউড় — ভক্তি সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্রবহীন ।

[জ]

আখড়াই গান —— বৈঠকী গান রাজা নবকৃষ্ণের রাজ সভায় এই গীতের এত রূপ দান করেন কুলুই চন্দ্র সেন ও নিধুবাবু । আচার্য সুকুমার সেন লিখেছেন — "আখড়াই গানের রচনা সংক্ষিপ্ত ও গাঢ়বন্ধ । তিনটি মাত্র গানে পালা শেষ হইত । প্রথমে মালসী অর্থাৎ দেবী বিষয়ক, তাহার পর প্রণয় গীতি, (সাধারণতঃ মিলনের আর্তি-সূচক), শেষে প্রভাতী (রজনী প্রভাতে মিলনের সম্ভাবনা দূর হওয়াতে আক্ষেপ) ।

ইহাতে ধ্রুবপদ - খেয়ালের মতো রাগের আলাপ ও সুরের বৈচিত্র্য দীর্ঘ বিলম্বিত হইত। আখড়াই নাম সেই জন্যই। বাজনা ও সঙ্গীতের বিশেষ পরিপাট্য ছিল। আখড়াই গানে বাজনার দ্রুততা (tempo) ছিল প্রধানত চারি প্রকার : পিঁড়ে বা পিঁড়ে বন্দী, (overture), দোলন (swing) সব দৌড় (Full tempo) এবং মোড় (climax)। কবি গানের মতো আখড়াই গাওনার প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে উত্তর - প্রত্যুত্তর হইত না। যে দল গান বাজনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইত তাহারই জয়।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড ২ সং - ডঃ সুকুমার সেন)

আখড়াই গানের প্রথম অংশটি মাত্র ভক্তি সাহিত্য ও সঙ্গীতের অন্তর্গত। কাজেই দেবী বিষয় গানের একটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

(ক) সুর — বাগেশ্রী

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরি সদাশিবে শুভ করি
নিরানন্দে আনন্দ দায়িনী ॥ ১
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা অজ্ঞান বোধে সাকারা
তত্ত্ব জ্ঞানে চৈতন্য রূপিণী ॥ ২
প্রণতে প্রসন্নাভাব ভীমতর ভবার্ণব
ভয়ে ভীত ভবানি ভবাণী ॥ ৩
কৃপার লোকন করি তরিবারে ভববারি
পদতরী দেহ গো তারিণী ॥ ৪
(রাম নিধি গুপ্ত)

আখড়াই গান জনপ্রিয় ছিল না। কবি গানের দাপটে তা আরও নিষ্প্রভ হয়। তখন নিধুবাবুর শিষ্য মোহন চাঁদ বসু কবি গানের কিছু অংশ মুখ্যতঃ সখীসংবাদ যোগ করে নতুন রূপ দিলেন। এর নাম হাফ আখড়াই। "হাফ - আখড়াইর গানের সুরের ও রাগের পারিপাট্য কম ছিল। ইহাতে হালকা তাল ব্যবহার হইত ; আর যন্ত্রের ব্যবহার কম ছিল। আখড়াই-এ প্রায় বিশ বাইশ রকম যন্ত্র বাজান

হইত। হাফ আখড়াইয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর বাদ প্রতিবাদ কখনো থাকিত তবে কবি গানের মত নয়।" (বাংলা সাহিত্যের কথা – ৪র্থ সং, ডঃ সুকুমার সেন)

(ঝ)

বৈষ্ণব তত্ত্ব নিবন্ধের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের রচনা মাত্রেই হয় পদ নয় পাঁচালী। পদ হইতেছে গান, একটি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ রচনা। ইহা অসংলগ্ন একটি মাত্র গান হইতে পারে অথবা ধারা বাহিক গানের সমষ্টি হইতে পারে। আর পাঁচালী হইতেছে ধারাবাহিক আখ্যায়িকা কাব্য। যাহা আসর ফাঁদিয়া গাওয়া হইত একাধিক দিবস ধরিয়া। রামায়ণ মহাভারত, মনসা মঙ্গল, চন্ডী মঙ্গল ইত্যাদি সবই পাঁচালী। এমন কি আলাওলের পদ্মাবতী এবং ভারত চন্দ্রের অন্নদা মঙ্গল পর্যন্ত।" — বলেছেন আচার্য ডঃ সুকুমার সেন (পাঁচালীর উৎপত্তি প্রবন্ধ, ডঃ সুকুমার সেন প্রাচ্যবানী প্রবন্ধাবলী, ২য় খন্ড)

ধারাবাহিক আখ্যায়িকা কাব্যের সাধারণ নাম পাঁচালী। পদ্যে রচিত আবৃত্তি, গান সহ ইহার প্রয়োগ হতো আসরে। রামায়ণ - মহাভারত, মনসা - চন্ডী ধর্ম ঠাকুর, মহাপ্রভুর মতো দেব-মানব, আবার দেবমহিমা নিরপেক্ষ লোর চন্দ্রাণীর প্রেম কাহিনী — সবই পাঁচালীর বিষয়। এটা ছিল সাধারণ ধারা। যেমন পদ বা পদাবলীর সাধারণ ধারা — গান, গীত সর্বস্বতা। মাঝে মাঝে — গদ্যে টীকা ভাষ্য।

উন বিংশ শতকের প্রথম দিকে ইংরাজী প্রভাব বর্জিত বাংলা জন সাহিত্যের বিশেষ করে ভক্তি গীতি সাহিত্যের যে রূপ - বৈচিত্র্য ছিল, তার একটি সামগ্রিক চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন কবি জয় নারায়ণ ঘোষাল, তাঁর শ্রী করুণা নিধান বিলাস (১৮১৪ - ১৫) গ্রন্থে। কিছুটা উল্লেখ করা যাক ——

সংকীর্ত্ত নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর
গড়া হাটি রাণি হাটি বিরহ মাথুর।
অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার
কবি পগতো তাল ফেরা শুনিতে মধুর ॥

পাঁচালীতে অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর
কতকথা (কথকতা) তরজাতে গারিতে প্রচুর ।
ভবানী ভবের গান মালসী মায়ার
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী বিজয়াতে ভোর ॥
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর
গোবিন্দ মঙ্গল জারি গাইছে সুধীর ।
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর
শ্রবণে যাহার গান ভকত আতুর
কালিয়াদমন রূপ চণ্ডী যাত্রা ধীর
রচিল চৈতন্য যাত্রা রসে পরিপূর ।
সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর
বাঙ্গালায় নব গান নূতন ঝুমুর ॥

এখানে যে পাঁচালী শাখার পরিচয় দিয়েছেন কবি জয় নারায়ণ ঘোষাল তা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকের । পরে পাঁচালী গান ও গাহনা রীতির এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে উনিশ শতকের তিনের দশকের মাঝামাঝি । দাশরথি রায় — ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচালীর আখড়া স্থাপন করে নতুন পদ্ধতিতে রচনা ও গাহনা সুরু করেন । উত্তরকালে পাঁচালী বলতে — দাশরথির নতুন পদ্ধতির পাঁচালীকেই বোঝাত ।

সুভাব কবি দাশরথি রায় প্রথম জীবনে কবির দলে ছিলেন । অফ্যা বায়তিনী বা অকাবই নামে এক মহিলার কবির দলের তিনি ছিলেন — উত্তর প্রত্যুত্তর বচসা-ও ছড়া কাটার প্রধান। কবির লড়াইতে এক আসরে তাঁর প্রতিপক্ষ নিধিরাম গুঁড়ি দাশরথির জাতি বর্ণাদি তুলে কটু গালাগাল করে । তাতে দাশুর আত্মীয় স্বজন — সকলে ঘোর অপমানিত বোধ করে দাশুকে কবির দল ত্যাগ করতে বলেন এবং দাশু কবির দল ত্যাগ করে পাঁচালীর দল গঠন করেন । কবির ছড়া অংশ যোগ করে — রচনা ও গাহনাতে অভিনবত্ব সৃষ্টি করে দাশরথি অল্পকালেই — নাম খ্যাতি অর্থ প্রতিপত্তি লাভ করেন । বাইশ বৎসরের পাঁচালীকারের জীবনে কলিকাতা ছাড়া-ও মেদিনীপুর, বর্ধমান,

হুগলী - নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ সহ সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে এবং ঢাকা যশোহর মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল মালদহ সহ সমগ্র পূর্ব বঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য রক্ষা করেছিলেন। প্রায় ৬৭।৬৮ টি পালা ও অনেক ছুট গান রচনা করেছিলেন দাশরথি। পুস্তকাকারে পাঁচালী সাহিত্যের প্রচার ও প্রকাশের অগ্রদূত -ও ছিলেন দাশরথি। প্রথমে বটতলা থেকে দশ খন্ডে পাঁচালী প্রকাশ করেন। তারপর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সর্বপ্রথমে বঙ্গবাসী প্রকাশন থেকে হরি মোহনের সম্পাদনায়। শেষে — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড: হরিপদ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় সমগ্র পাঁচালী প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্করণের ভূমিকাতে সম্পাদক যে মন্তব্যটি করেছেন — এক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা যায়।

"দাশরথির সমগ্র পাঁচালীর পটভূমি ভক্তিরস। এই পটভূমিটি নানা রসের ধারায় অভিসিক্ত হইলেও ইহার প্রধান ধারা দুইটি হইতেছে করুণ - বিপ্রলম্ভ ও হাস্য রস। পাঁচালীর আকাশ অশ্রু হাস্যের মেঘরৌদ্রে বিচিত্র। তদুপরি পাঁচালী অন্যান্য জন সাহিত্যের মত প্রচার - প্রধান সাহিত্যে শুধু আনন্দ পরিবেশন নহে লোক শিক্ষাই ছিল পাচালীর মুখ্য উদ্দেশ্য।" (দাশরথি রায়ের পাঁচালী — শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

মানুষ সামাজিক জীব। কাজেই তার চিন্তা ভাবনা, ক্রিয়া - কর্মের মধ্যে সমকালের একটা বিশেষ স্থান থাকেই তবে মধ্য যুগের ও যুগসন্ধির কালের অধিকাংশ সাহিত্যিক রচনায় তার প্রকাশ গৌণ ও প্রচ্ছন্ন। অনুবাদ সাহিত্য -ও মঙ্গল সাহিত্যের মধ্যে এই প্রভাব — সমাজ সচেতনতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি। কবির গানে ছড়ার অঙ্গে তার একটা স্থূলদিক আছে — যেটা পরে সং মধ্যে এবং প্রহসন ব্যঙ্গ নাটকাদির মধ্যে প্রসারিত। নতুন পদ্ধতির পাঁচালীতে বহুক্ষেত্রে সমাজসচেতনতার সাক্ষ্য সুস্পষ্ট। স্বাভাবিক ভাবেই প্রাচীন ভাবধারা রসে পুষ্ট পাঁচালীকারগণ ও তার শ্রোতৃমন্ডলী — মুখ্যতঃ রক্ষণশীল। তবু বিষয়ের উল্লেখ সরাসরি করা হয়েছে এবং তার সম্বন্ধে মতামত দেওয়াও হয়েছে। নানা পালার মধ্যে দাশুরায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে, কৌলিন্য প্রথা, কালো মেয়ের বিবাহ সমস্যা, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের লোভ ইত্যাদির আলোচনার সঙ্গে বিধবা বিবাহ, কর্তাভজা, শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব প্রমুখ বিষয়ে আলাদা পালা রচনা করেছিলেন।

দাশরথির সমকালে ও পরে বড় পাঁচালীকার নামে যারা পরিচিত ছিলেন — তাদের মধ্যে গঙ্গা নারায়ণ নস্কর, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, ঠাকুর দাস দত্ত, রসিক চন্দ্র রায়, ব্রজ মোহন রায়, মনোমোহন বসু, গঙ্গাচরণ সরকার, কৃষ্ণধন দে, নন্দলাল রায় উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে রসিক চন্দ্র রায় ছিলেন বিশেষ প্রতিভার অধিকারী এবং পাঁচালী ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থ — হরি ভক্তি বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাঙ্কুর, দশ মহাবিদ্যা সাধনাদি বিচিত্র বিষয়ে অনেক পুস্তক রচনা করেছিলেন। দাশরথির থেকে ১৫ বৎসরের কনিষ্ঠ এই বন্ধুটি ১১ খণ্ড পাঁচালী রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। পৌরাণিক পালা ছাড়াও সমসাময়িক ঘটনা — ঝড়ের কাণ্ড, ডেঙ্গু জ্বর, ইত্যাদি বিষয়ে পালা রচনা করেছিলেন। পাঁচালীকার ব্রজমোহন রায় ছিলেন দাশুর চেয়ে ২৫ বছরের কনিষ্ঠ। তিনিও পৌরাণিক পালার সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গল, বাবুদের কীর্তি ইত্যাদি সম সাময়িক পালা রচনা করেছেন। তাঁর অন্যতম গুরুত্ব — তিনি শেষে পাঁচালী রচনার পর যাত্রা পালা রচনা ও দল গঠন করেছিলেন। অবশ্য যাত্রার পালাগুলিও পৌরাণিক বিষয়ে রচিত রামাভিষেক, অভিমন্যু বধ, সাবিত্রী সত্যবান ইত্যাদি।

পাঁচালীর পথ ধরেই উত্তর কালে যাত্রা গানের উদ্ভব হয়েছে বলে মন্মথ মোহন বসু প্রমুখ অনেকে মনে করেন। কিন্তু 'যাত্রা' ও 'নাটক' শব্দগুলি প্রাচীন। জয় নারায়ণ ঘোষাল লিখেছেন —

কালিয় দমন রাস চণ্ডী যাত্রা ধীর।
রচিল চৈতন্য যাত্রা রসে ভরপুর ॥

তারো আগে মধ্যযুগে যে যাত্রা ছিল তার কথা বলেছেন বৃন্দাবন দাস — শ্রীচৈতন্য ভাগবতে — (৩।৪।৪৫)

কৃষ্ণ - যাত্রা অহোরাত্র কৃষ্ণ সংকীর্তন।
ইহার উদ্দেশ্য নাহি জানে কোন জন ॥

মহাপ্রভু - ও চন্দ্রশেখরের গৃহে "অংকের বিধানে" যে নৃত্য করেছিলেন। কাচ সজ্জা করে অভিনয় করেছিলেন (শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্য খণ্ড, অষ্টাদশ অধ্যায়) তাও যাত্রা গানের-ই অন্যবিধ রূপ মাত্র। নাটক সৃষ্টির মূলে, কেবল ভারতে

নয় সর্বদেশেই — সংলাপ গীতাদি সহ নাট্যত্ব কথা আছে নাটক সৃষ্টির মূলে পালা - কীর্তন , কথকতা ইত্যাদির মধ্যে-ও এর সূত্র পাওয়া যায় । এর আগে পাঁচালীকার ব্রজমোহন রায় প্রসঙ্গে দেখা গেছে তিনি পাঁচালী পালা রচনা ও গাহনার পরে যাত্রা পালা রচনা ও গাহনা সুরু করেন । বিষয় এক তার প্রকাশ রীতি ও আঙ্গিক আলাদা । এ দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই অনুমিত হয় যে পাঁচালী থেকে যাত্রা একটি সহজ উত্তরণের পথ রেখা । যাহোক এ সম্বন্ধে — অধ্যাপক ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী যে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সূত্র দিয়েছেন সেটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য —" নাট্য শিল্পের উন্মেষ পর্ব সম্পর্কে সেই জন্য অধ্যাপক বসুর সিদ্ধান্ত বিশেষ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা চলে । যাত্রার উদ্ভব প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মতবাদ-ই গ্রহণ যোগ্য বলিয়া মনে করি । তবে নিছক পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব এই মন্তব্য না করিয়া যদি তৎকালীন জনরুচির পরিমন্ডলটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তবে বলিতে হয়, যাত্রা কোন একটি বিশেষ ধারার মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে নাই । তৎকালীন জনরুচির পোষকতা করিত কবি গান, পাচালী কীর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন সাহিত্য সঙ্গীত ধারা । এই সাহিত্য সঙ্গীত ধারায় সম্মিলিত সৃষ্টি — যাত্রা । আচার্য শ্রী দে-র মন্তব্যটি প্রসঙ্গতও স্মরণযোগ্য — Jatra, a spices of popular amusement which was closely attached to Kavi and Panchali

(উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য — ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী)

(এ)

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরাজী প্রভাব বর্জিত জনসাহিত্যে — বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের পালার পরিবেশনায় বেশ কয়েকটি নতুন ঢং এর উদ্ভব হয়েছিল । সাধারণ লীলা কীর্তন পদ্ধতি তো ছিলই — তার সঙ্গে কিছু কিছু প্রয়োগ বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছিল সঙ্গীত রচনায় বিশেষ করে গাহনায় আঙ্গিকে । এদের মধ্যে তিন জনের নাম উল্লেখযোগ্য — রূপচাঁদ পক্ষী, মধুসূদন কিন্নর বা মধুকান আর কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

রূপচাঁদ ছিলেন উড়িষ্যাবাসী। তাঁর পিতা কলিকাতা বহুবাজার অঞ্চলে থাকতেন এখানে-ই রূপচাঁদের জন্ম হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর আসল নাম রূপ চাঁদ দাস মহাপাত্র। সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন — রচনাতে -ও। নারায়ণ মিশ্রের নেতৃত্বে পাঁচ ইয়ার গঠিত পক্ষীর দলে তিনি ছিলেন পরুড়। চুটকি গান, রং তামাসার গান রচনা ও গাহনাতে-ই তার সর্বাধিক খ্যাতি থাকলে-ও তাঁর মুখ্য রচনা কিন্তু অনবদ্য ভক্তি সঙ্গীত। ড: অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —"রূপচাঁদের ২১১ টি গানের মধ্যে অধিকাংশই পাঁচালী গানের ভক্তি সঙ্গীত, আর কিছু দেহতত্ত্ব বিষয়ক গীতি সঙ্গীত। তাঁর কয়েকটি রঙ্গকৌতুকের গান অন্তর্নিহিত হালকা চালের জন্য কলকাতায় সমাজে খুব চলেছিল বটে, কিন্তু তাঁর বেশীর ভাগ গান-ই ভক্তি রসের" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খন্ড)। তাঁর অধিকাংশ ভক্তির গানে ভণিতা থাকত — খগ, দীন খগের, খগপতি ইত্যাদি একটি নমুনা দেওয়া যাক —

সই হের নব জলধর বরণে।
কটিতটে পীতাম্বর কিবা শোভাকর
মনোহর মুরহর বংশীবদনে,
চরণ অরুণ - কর, নখরেতে নিশাকর
মনোহর শোভাকর জানু করিকর জিনে
চূড়াটেরা মনোহর, তাহে বেড়া গুঞ্জহার
পক্ক পক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর সুধাক্ষীর বচনে ॥
শ্রীনন্দের কুমার পূতনা নিধন কর
ননি চোর বৃন্দা বিপিনে
নট শঠ নাগর ব্রজবধূ মন চোর
স্মরশর নয়ন - সন্ধানে।
ভণে দীন খগবর সযতনে ধ্যানে ধর
শ্যামল সুন্দর ধনে।
যাবে যদি ভবপার ভাব ভবকর্ণধার
রে মূঢ় মন আমার হৃদি পদ্মাসনে ॥

মধুকান

মধুকান — মধুসূদন কিন্নর জন্ম গ্রহণ করেন যশোর জিলার বনগ্রাম মহকুমার উলসিয়া গ্রামে ১২২৫ সালে (১৮১৮ – ১৯ খ্রী)। পিতা তিলক চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়েও মধু দারিদ্র্যের জন্য তেমন লেখা পড়া শিখতে পারেন নি। যৌবনে ঢাকায় ওস্তাদ ছোট খাঁ ও বড় খাঁর কাছে এবং যশোরের রাধামোহন বাউলের নিকট সঙ্গীত - শিক্ষা করেন। তিনি ঢপ কীর্তন নামে এক বিশেষ পদ্ধতিতে রচনা ও গাহনা করতেন —"অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে পাঁচালী, বাউল গান, কথকতা, ও নাট গীতির প্রভাবে কীর্তনের এক নতুন শাখার সৃষ্টি হয়। তাকেই ঢপ কীর্তন বলে। ঢপ্ কথাটি হিন্দী ঢব থেকে গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয়। হিন্দী ঢব্ এর অর্থ ঢং রীতি, ধরণ,"
(বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — চতুর্থ খণ্ড — অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।)

ঢপ কীর্তনের চারটি পালা — কলঙ্ক ভঞ্জন, অক্রূর সংবাদ, মাথুর ও প্রভাস সংগ্রহ করে শ্রী পাঁচকড়ি দে মহাশয় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন ১৩৪৩ সালে। এই সংগ্রহ ছাড়াও মধুর অনেক ছুট গান আছে। ঢপ কীর্তনের গাহনা রীতি সম্বন্ধে পাঁচকড়ি দে মন্তব্য করেছেন —"ঢপ - কীর্তন গায়ককে একাই সর্ব চরিত্রের অভিনয় করিতে হয়।" মধু তাই করতেন। উত্তর কালে অবশ্য তার পরিবর্তন হয়েছিল।

বাঙালীর গান গ্রন্থের সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় লিখেছেন —
"তাহার সঙ্গীতগুলি ভক্তি রস প্রধান। গানের সুর তিনি কাহার অনুকরণ করেন নাই — স্বয়ংই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 'মধু কানের সুর' এখন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাহার অধিকাংশ গীত 'সূদন' ভণিতাযুক্ত। এক সময় কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করেন — 'মধু তুমি মধু নাম ত্যাগ করে সূদন ভণিতা দাও কেন? তাহার উত্তরে মধু বলিয়াছিলেন —'মধু পাছে বিষ হয় এই ভয়ে মধু নাম দিতে আমার সাহস হয় না'।"
(বাঙ্গালীর গান — পৃ. ৩১২)

মাথুর পালার একটি গানের উদাহরণ দেওয়া যাক —

বৃন্দকে কৃষ্ণ বাঁশী দিতে চেয়েছেন —

কথা

কৃষ্ণ — ভাল বাঁশী না লও, প্রাণ।

বৃন্দা — না, ঠাকুর আমি তোমার ও প্রাণের পূর্ণ সুর জানি । ও প্রাণে কাজ নাই । প্রাণ নিলেই প্রাণ যাবে । তোমার প্রাণ তোমারি থাক ।

গীত

রাগিণী সিন্ধু । তাল মধ্যমান ঠেকা

প্রাণ দিও না ও আশা ভাল না ।
কাঙ্গালের প্রাণে সাজে না ।
এক প্রাণ দেও যারে তারে
দেখিতেছি পরস্পরে,
এমন প্রাণের আশা যে করে
যে তোমারে প্রাণ দিলে তখনি তার প্রাণ নিলে
কেউ নিলে ত সুখে থাকে না
শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুর রস হরি
জানি তোমার পঞ্চ রসে যে রসে যে রসে হরি
বলি তোমার এ কি লীলে
বলি তোমার প্রাণ কে নিলে
অদিতি কশ্যপ ত্যজিলে
তাই তে তারা প্রাণ ত্যজিলে,
এই কি তোমার লীলার মন্ত্রণা ॥
ত্রেতা যুগে করে লীলে, সিতার প্রাণ নিলে,
জানকী আনিলে পুনঃ জানকী ত্যজিলে,
তারপরে দাপরে লীলে, কারাগারে জন্ম নিলে
বন্দীশালে তারে রাখিলে জানিলে শুনিলে লীলে ।
কেউ ফেরে না প্রাণ যাচিলে
সুদন কয় সকলি বঞ্চনা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কমল গোস্বামী

ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়ে তো বটেই — ভক্তি সাহিত্যে তথা কৃষ্ণ পালা রচনার দান ও অবদান সম্বন্ধে এবং পাণ্ডিত্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দিক থেকেও শ্রীকৃষ্ণ কমল গোস্বামীর সঙ্গে রূপচাঁদ ও মধু কানের কোন রকম তুলনা করার প্রশ্ন ওঠে না। মহাপ্রভুর পার্শ্বচর কংসারি সেন ও তৎপুত্র সদা শিবের বংশে কৃষ্ণ কমল জন্ম গ্রহণ করেন ১৮১০ মতান্তরে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে। যশোহর জিলা এদের আদি নিবাস — পিতার নাম মুরলীধর মাতা যমুনা দেবী। পিতা মুরলী সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন — পুত্র কৃষ্ণ কমলকে তিনি নিজেই সংস্কৃতাদি শিক্ষা দেন এবং সঙ্গে করে বৃন্দাবনে নিয়ে যান। নবদ্বীপেও কিছু কাল সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন কৃষ্ণ কমল। বৈদ্য হয়েও এঁরা বৈষ্ণব সমাজে সম্ভ্রান্ত গোস্বামী পদে স্থিত ছিলেন। পুরাণ পাঠ, কীর্তন, ভাগবত কথকতাতে কৃতিত্ব অর্জন করে ছিলেন। বিবাহের পর এক শিষ্যের সঙ্গে ঢাকায় যান। পরে এটি-ই তাঁর নিজ ক্ষেত্র হয়। বড় গোঁসাই নামে খ্যাত ছিলেন। অন্যান্য বৈষ্ণব - গ্রন্থ ও সঙ্গীতাদি বাদে সুপ্ত বিলাস দিব্যোন্মাদ বা রাই উন্মাদিনী বিচিত্র বিলাস প্রমুখ কৃষ্ণযাত্রা রচনা ও গাহনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার রচনা আবেগ - বহুল পদ্যে তথা গীতে রচিত। আসলে তা কীর্তনাদেরই এক প্রসারণ।
"কৃষ্ণ কমল যাহা কীর্তনে গান করিতেন তাহাই রূপায়িত করিলেন যাত্রায়। তাহার কাব্যে যে রাধাকৃষ্ণ প্রেম কাহিনী রূপায়িত হইয়াছে তাহা প্রাকৃত প্রেমিক প্রেমিকার ভাল বাসার ঘটনা গর্ভ ইতিহাস নহে। মহাভাব স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণীর অলৌকিক দিব্য প্রেমের সঙ্গীতময় রসৈক সর্বস্ব রূপ দান করিয়াছেন কৃষ্ণকমল।" অধ্যাপক ড: বৈদ্যনাথ শীলের উক্ত মন্তব্যটি সারগর্ভ মর্মবাণী (বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা— ড: বৈদ্যনাথ শীল, প্রথম অধ্যায়)।

বিষয় বস্তুর গৌরবে নয় — আবেগময় সঙ্গীতময় রচনা শৈলীর মধুর ধ্বনিতে — গভীর অকৃত্রিম ভক্তি রসের আন্তরিক নিবেদনে তাঁর পালাগুলি কেবল রসিক ভক্তের মনে নয়, সাধারণ শ্রোতার হৃদয়েও আনন্দময় তরঙ্গ তোলে। কৃষ্ণকমলের শ্রেষ্ঠ নাট্য রচনা দিব্যোন্মাদ বা রাই উন্মাদিনী।

পালাটি একটু বিশ্লেষণ করলেই — কৃষ্ণ কমলের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য বুঝা যাবে। প্রথমে গৌর চন্দ্রিকা ——

ফলে গোরাচাঁদ হয়ে দিব্যোন্মাদ
উদ্দীপন ভাবে ভেবে কালাচাঁদ
ধরতে যায় করিয়ে দৈন্য।

তারপর প্রস্তাবনা — কৃষ্ণ হীন গোকুল। নাটকের অকুস্থল দুটি — বৃন্দাবন ও মথুরা। বৃন্দাবনের ছয়টি দৃশ্য — প্রথম নন্দালয়ে যশোদার আকুতি — বাৎসল্য রস। দ্বিতীয়ে ব্রজপথে রাখালগণ — সখ্যভাবে ক্রন্দন। তৃতীয় — শ্রীরাধা সদন। চতুর্থে রাধা কৃষ্ণ সন্ধানে চললেন বনে সখীদের সঙ্গে। পঞ্চমে গেলেন কদম্ব কাননে। রাধিকার মনে হল কানাই লুকিয়ে আছেন। ষষ্ঠে প্রবেশ করল কুঞ্জকাননে রাধা — কত মিলন - বিরহের স্থল। সেখানে ডেকে না দেখে মূর্ছিতা হয়ে গেলেন তিনি। দশম দশা উপস্থিত। হেন কালে এলেন প্রতি নায়িকা চন্দ্রবলী। তিনি রাধার অবস্থা দেখে চললেন মথুরায় — কৃষ্ণকে নিয়ে আসবেন। তারপর মথুরা। মথুরার দুটি দৃশ্য — প্রথমটি রাজপথ দ্বিতীয়টি অন্তঃপুর। কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর গানে গানে সংলাপ। রাধার অবস্থা শুনে কৃষ্ণ বললেন চন্দ্রাবলীকে তুমি যাও আমি আসছি। আবার ঘটনাস্থল বৃন্দাবন — নিকুঞ্জকানন। রাধাকৃষ্ণের মিলন।

পদাবলী কীর্তনের বা পৌরাণিক ভাবনা বিয়োগান্ত বা ট্রাজেডি থাকে না। জীবনে আত্যন্তিক বিরহের স্থান নাই আছে সাময়িক বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের।

আচার্য ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের দুটি মন্তব্য উদ্ধার করে — কৃষ্ণকমল প্রসঙ্গটি শেষ করা যাক।

(ক) তাঁহার কৃষ্ণকমলের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক রাই উন্মাদিনীতে (দিব্যোন্মাদ) চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের সারকথা প্রদত্ত হইয়াছে। রাধার প্রতি যে সকল ভাব আরোপ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিটি-ই চৈতন্য জীবনের কোন না কোন অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। বাস্তবের ভিত্তিতে এই স্বপ্নলোকের সৌধ নির্মিত হইয়াছে।

(খ) "মণিমালার মধ্যে যেমন মধ্যমণি কৌস্তুভ, কৃষ্ণকমলের কাব্যগুলির মধ্যে 'রাই উন্মাদিনী' সেইরূপ। সুপ্নবিলাসে যে ভাবের উদয় রাই উন্মাদিনীতে তাহার পরিণতি। সুপ্ন বিলাসের ভাবগুলি কতকটা অসমুদ্ধ। খুব জমাট বাঁধে নাই, রাইউন্মাদিনীর অনেক কথাই উহাতে আছে, কিন্তু শেষোক্ত কাব্যে যে নিপুণতা রচনা কৌশল ও ঔজ্জ্বল্য আছে, তাহা সুপ্ন বিলাসে নাই।" (কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী — কাব্য সমালোচনা — রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন ডি.লিট)

(ট)

সমকালের ভক্তি সাহিত্যের প্রাণ মাতানো বলিষ্ঠ প্রকাশ হয়েছিল কৃষ্ণযাত্রার মধ্যেও তবে অন্য আঙ্গিকে গোবিন্দ অধিকারী, ব্রজ মোহন রায় প্রমুখ যাত্রাকারের রচনায়। অবশ্য একালের কৃষ্ণযাত্রার মূল ধারার উৎস মূলে ছিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী। কৃষ্ণ কমল গোটা পালাই পদ্য ও গীতের আধারে রচনা করেছেন, কিন্তু গোবিন্দ অধিকারী গদ্য কথা বক্তৃতা, এবং সংলাপে গদ্য রীতির প্রচলন করেন। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কালীয় দমন কলঙ্ক ভঞ্জন, মুক্ত লতা বসন প্রমুখ ১৬।১৭ খানি পালা রচনা ও অভিনয় করেছেন তিনি। নিমাই সন্ন্যাস-ও রচনা করেছিলেন। তিনি নিজে পালাতে অংশ গ্রহণ করতেন মুখ্যতঃ বৃন্দাদূতীর ভূমিকাতে। তাঁর অভিনয়কলা কিংবদন্তীর মতো হয়ে আছে। বাঙ্গালীর গানের সম্পাদক লিখেছেন "তিনি তাঁহার কৃষ্ণ যাত্রায় নিজে দূতী সাজিতেন। তাঁহার দূতী গিরি দেখিবার জন্য দশ ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া লোকে যাত্রা শুনিতে আসিত। দূতী সাজিয়া যখন তিনি আসরে নামিতেন তখন চারিদিকে একটা মহা হৈচৈ পড়িয়া যাইত, আনন্দে শ্রোতৃবৃন্দ হরিধ্বনি করিয়া উঠিতেন" (বাঙ্গালীর গান — পৃ. ৩২১)। এই বার যাত্রা পালাতে সংলাপের মধ্যে মুখ্যতঃ শ্লেষাত্মক উক্তি ও ব্যঙ্গ স্তুতি — শ্রোতৃগণের অন্তর আবেগে উদ্বেল করত। গোবিন্দ অধিকারী রচিত 'শুক - শারীর' দুদুটি উনিশ শতকে যাত্রা সাহিত্যের সীমা উত্তীর্ণ করে এখনো ভক্ত রসিক হৃদয়ে কৌতুক - সুগন্ধি বিতরণ করে।

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের
রাই আমাদের রাই আমাদের
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের ॥

শুক বলে — আমার কৃষ্ণ মদন মোহন।

শারী বলে – আমার রাধা বামে যতক্ষণ
নইলে শুধুই মদন ।
শুক বলে – আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল
শারী বলে - আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল
নইলে পারবে কেন ?
শুক বলে - আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা
শারী বলে - আমার ধারার নামটি তাতে লেখা –
ঐ যে যায় গো দেখা ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণের চূড়া বামেই হেলে ।
শারী বলে - আমার রাধার চরণ পাবে বলে
চূড়া তাই-তে হেলে ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণ যশোদা জীবন
শারী বলে - আমার রাধা জীবনের জীবন
নইলে শূন্য জীবন ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণ জগৎচিন্তামনি
শারী বলে - আমার রাধা প্রেম প্রদায়িনী
সে তোমার কৃষ্ণ জানে ॥
শুক বলে – আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান ।
শারী বলে – সত্য বটে বলে রাধার নাম
নৈলে মিছে সে গান ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু
শারী বলে - আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু
নৈলে কে কার গুরু ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী
শারী বলে - আমার রাধা প্রেমের লহরী
প্রেমের ঢেউ কিশোরী ॥

শুক বলে - আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা
শারী বলে - আমার রাধা করে আনা গোনা
নৈলে যেত জানা ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণ জগতের কালো ।
শারী বলে - আমার রাধার রূপে জগৎ আলো
নৈলে আঁধার কালো ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণের শ্রী রাধিকা দাসী
শারী বলে - সত্য বটে সাক্ষী আছে বাঁশী
নৈলে হত কাশী বাসী ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণ করে বারিবরষণ
শারী বলে - আমার রাধা স্থগিত পবন
সে যে স্থির পবন ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ
শুরী বলে - আমার রাধা জীবন করে দান
থাকে কি আপনি প্রাণ ॥
শুক শারী দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল —
রাধা কৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল ।
(বলে বৃন্দাবন চল ।) ॥

গোবিন্দ অধিকারীর শিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়-ও যাত্রাদল গঠন, পালা রচনা ও গানো করেছেন । সুকণ্ঠ নীলকণ্ঠের গানের খ্যাতি ছিল । তিনি-ও সখীর ভূমিকা করে গেছেন । কৃষ্ণকালী শিব সব দেব দেবীকে নিয়েই নীলকণ্ঠ সঙ্গীত রচনা করতেন । নীলকণ্ঠ পদাবলী গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত । যাত্রা পালা ছাড়া-ও ছুট সঙ্গীত রচনার প্রথা ছিল । এ সময়ের গীতকার বা পালাকারদের মধ্যে একটি স্থিরল স্তব — গঙ্গাস্তোত্র গীতি রচনা করেছিলেন নীলকণ্ঠ । দশটি স্তবকে রচিত স্তবগীতিটির কেবল প্রথম অংশ উদ্ধার করা গেল ।

সুরশৈবলিনী জগৎ জননী
শংকর মৌলী বিবাসিনী গঙ্গে
মম পাপাটবী ছেদসা জাহ্নবী
কৃপাণ স্বরূপ কৃপা - অপাঙ্গে ॥
গোলোক ত্রিলোক ত্রিধারা
ত্রিলোক আরাধ্যা সর্ব সারাৎসারা
সর্ব তীর্থময়ী সর্ব পাপ হরা
ভবদারা ভব কলুষ ভঙ্গে ।
বিষ্ণু পদোদ্ভবা সকলেতে গায়
কিন্তু কিমাশ্চর্য কার্য দেখা যায়,
তোমার জীবনে জীবন যদি যায়
বিষ্ণুলোক পায় পাপাদে ॥
কে জানে মা গঙ্গে তব গুণ গরিমা
বিধি বিষ্ণু শিব দিতে নারে সীমা
আমি জ্ঞানহীন কেমনে কহি মা
অসীম মহিমা তব দ্রবাঙ্গে ।। (বাঙালীর গান – পৃ. ৭৫২)

দাশরথির প্রায় সমকালবর্তী পাঁচালীকার ব্রজমোহন রায় — পাঁচালীর দলকে যাত্রার দলে রূপান্তরিত করেন । তিনি রামাভিষেক, অভিমন্যু বধ , কংস বধ ইত্যাদি ১টি যাত্রার পালা রচনা ও গাহনা করেছিলেন । আঙ্গিক ছিল গোবিন্দ অধিকারীর মতো তবে বক্তৃতা - সংলাপের গদ্য কিছুটা দীর্ঘ ও ভাষা সংস্কৃতগন্ধী ছিল ।

উনিশ শতকে ভক্তিরস প্রধান ও প্রচার ধর্মী যাত্রা পালাকারদের মধ্যে অন্যতম খ্যাতিমান ছিলেন মতিলাল রায় । শুধু কৃষ্ণ কথা নয় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি থেকে বিষয় সংগ্রহ করে তিনি — অনেকগুলি পালা রচনা করেন । ড: অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মতিলাল সম্বন্ধে লিখেছেন ——" যাত্রাকে তিনি লোকশিক্ষার অঙ্গ বলে মনে করতেন , কাজেই এর মধ্যে চরিত্র ও সমাজ কল্যাণকর

পৌরাণিক নীতি ও আদর্শের জয় ধ্বনি করা হয়েছে । * * * *
পুরাতন যাত্রা গানের প্রচলিত আদর্শ তিনি অনেকাংশে পরিত্যাগ করেন । যাত্রার পালাকে অংকে গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করে এবং দীর্ঘ সংলাপ (বক্তৃতা ও কথকতার মতো অতি দীর্ঘ্য ব্যবহার করে তিনি যাত্রা গানকে যাত্রাভিনয়ে রূপান্তরিত করেন । নীলকণ্ঠ পর্যন্ত যাত্রার যে পুরাতন রীতি ছিল তা তিনি ত্যাগ করে যাত্রাকে পুরাপুরি নাটকের রূপ দেন ।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত – ৪র্থ খন্ড)

(ঠ)

যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত ইহলোক ত্যাগ করেন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে - সিপাহী বিদ্রোহের দু বৎসর পর এবং রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের তিন বৎসর পূর্বে । ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ ছিল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের-ও প্রকাশ কাল । বস্তুত: এই সময় থেকেই যথার্থ ভাবে আধুনিক যুগের আরম্ভ এবং ইংরাজী প্রভাব বর্জিত বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত সমাপ্তি কাল । ভারত চন্দ্রের মৃত্যু থেকে ঈশ্বর চন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্যন্ত মোটামুটি শত বৎসর কালকে বলা যায় মধ্য যুগের অবসান ও আধুনিক যুগের অভ্যুদয় কাল । একদিক থেকে এই শত বৎসরকে যুগসন্ধির কাল বললেও খুব একটা ভুল হয় না । উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির যাত্রা শুরু হয়েছিল — তাতে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল বাঙালীর শিল্প ভাবনা ততোধিক সাহিত্য শিল্প - ভাবনা । একটি পুরাণো দিক — ইংরাজী প্রভাব বর্জিত ধারা, অপরটি নূতন দিক ইংরাজী প্রভাব পুষ্ট ধারা । যুগসন্ধির প্রথমার্ধটিতে ইংরাজী প্রভাব বর্জিত বাংলা সাহিত্য ধারায় — কবি, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পাঁচালী - কৃষ্ণযাত্রা প্রমুখ শাখার নানা বৈচিত্র্য ও বিবর্তনের তথা ভালভাবে টিকে থাকার ব্যর্থ প্রয়াসের ইতিহাস । সেটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রস্তুত অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে । যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্ত — দুটি ধারার মধ্যে অবাধে বিচরণ করেছেন । আধুনিকতাকে — তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে আহ্বান করেছেন এবং প্রাচীন ধারার গঙ্গাযাত্রার কীর্তনে-ও সামিল হয়েছে । তিনি কবি-পাঁচালী - টপ্পা গীতের কেবল সংগ্রাহক ও ঐতিহাসিক ছিলেন না, কবির আসরে নিজে-ও গীত রচনা

করেছেন। তাঁর রচনা রীতির মধ্যে একটি সরল স্নিগ্ধ সাহিত্যরস সমৃদ্ধ উজ্জ্বল্য ছিল — যা একান্তভাবে বাঙ্গালীর নিজস্ব। বোধ হয় এই কারণেই বঙ্কিম চন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে শেষ খাঁটি বাঙালী কবির শিরোপা দিয়েছেন। "এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখেন নাই — আর লিখিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল ভাষা নহে ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা, দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তার কবিতায় কেলাকো ফুল নাই।" (ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব — শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা।)

গুপ্ত কবির শিষ্য মন্ডলীর মধ্যে এই দুই ধারারই প্রতিনিধি ছিলেন যাঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন — বঙ্কিম-দীনবন্ধু রঙ্গলালরা একদিকে — অপর দিকে মনোমোহন বসু প্রমুখ, মনোমোহন — হাফ আখড়াই, কবি, গীতাভিনয়, পাঁচালী প্রমুখ — ইংরাজী প্রভাব বর্জিত ধারায় বহু পালা গান রচনা করেছেন। আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন —"কবি গান ও পাঁচালী রচনায়, সাময়িক পত্র পাঠ চালনায় এবং উপদেশাত্মক বক্তৃতায় মনোমোহন প্রাচীন পল্লী সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। মনোমোহনও ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খন্ড, সুকুমার সেন) তাঁর রচিত ঈশ্বর বিষয়ক একটি ভক্তি সঙ্গীত উল্লেখ করা যাক —

তুমি আদি কারণ সর্বসাক্ষী সনাতন, রূপহীন
নিত্য নিরাময় জগজ্জীবন নিরঞ্জন ॥
সদা শিব সদানন্দ রূপ মহাব্যাম বক্ষ অনুপ,
সৃজন পালন লয় ত্রিগুণ - ত্রিনয়ন,
ব্যাপ্তি নামে ভুজ — অনন্ত সুশোভন ॥
সর্বজীবে সম দরশন পাপি হৃদয় তাপ হরণ।
শান্তি শিরসি - জটাভিহত করুণা গঙ্গা ধারণ।
জপ তপ ধ্যান জ্ঞানাতীত গুপ্ত ভাবফণি বেষ্টিত
মহিমা বিমাণ বিশ্বে বাদিত, নিনাদিত
নাস্তিক্য মোহ মরণ বিনাশন ॥

(মনোমোহন গীতাবলী — গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

তখন যাত্রা গানের আর একটা মাত্রা [illegible] পেয়েছে — নাম হয়েছে গীতাভিনয় , দীর্ঘ বক্তৃতা ও জুড়ির গান দিয়ে পরিবেশ - স্থান কালাদির সংকেত হোতো । আচার্য সুকুমার লিখেছেন ——" গীতাভিনয় অর্থাৎ আধুনিক যাত্রার মূলে পাঁচালীর প্রভাব-ও কম নয় । এই প্রভাব আছে আখ্যান বস্তুতে আর গানের সুরে । তাছাড়া দীর্ঘ বক্তৃতায়, কথকতায় প্রভাব রহিয়াছে । * * * মনোমোহন বসুর নাটকগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় ।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস – দ্বিতীয় খন্ড – সুকুমার সেন)

মনোমোহন রচিত গীতাভিনয়ের পালাগুলির মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই পুরাণে যাত্রা - পাঁচালীর কথাকতার ভক্তি-ভাবের প্রাধান্য ছিল । হরিশ্চন্দ্র, পার্থ পরাজয়, যদুবংশ ধ্বংস, রামাভিষেক সতী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

(ড)

উনিশ শতকের ইংরাজী প্রভাব পুষ্ট শাখায় কাব্যে ভক্তি-ভাবের আবেদন শীর্ণতর হয়েছে । ঈশ্বর গুপ্ত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কবিতা লিখেছিলেন । তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য [illegible] লিখলেন ঐতিহাসিক কাব্য । তারপর মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভেরী বাজিয়ে আবির্ভূত হলেন নব্য বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গনে । কী নাটক কী মহাকাব্য — বিষয়গুলি তিনি পুরাণ ভান্ডার হতে আহরণ করলে-ও নতুন মানবতা ও প্রেমকে, বুদ্ধির দিক দিয়ে গ্রহণ করলেন । এমন কি ব্রজাঙ্গনাতে ব্রজ বালাদের আবেগ সুন্দর ছন্দের আঙ্গিকে — কেমন যেন মেকী ও কৃত্রিম বলে বোধ হয় । হেমচন্দ্র ও নবীন চন্দ্র দু'জনই মহাকাব্য রচনা করেছেন । কৃষ্ণ চরিত্রকে মূল করে নবীন চন্দ্র রৈবতক – কুরুক্ষেত্র – প্রভাস লিখলেন — কিন্তু হৃদয়াবেগের সেই সহজাত তীব্রতা রইল না । বিহারী লাল তাঁর কাব্যের সুরে রোমান্টিক চেতনার দোতরায় সৌন্দর্য ও প্রেমের তার বাঁধলেন । স্বাভাবতই প্রকৃতি, প্রেম - নারী মুখ্য স্থান নিল । মূলতঃ ইংরেজ কবিদের প্রচ্ছন্ন প্রভাবে । অর্থাৎ উনিশ শতকের ইংরাজী প্রভাব পুষ্ট কাব্য শাখায়

ভক্তির - কুঁড়ি — হৃদয়াবেগের তাপে অংকুর ফুটে উঠল না ।

পক্ষান্তরে নাটকের পথায় ভক্তি আবেগ খানিকটা স্থান পেল । দীনবন্ধু মিত্র সামাজিক বিষয়গুলিকেই বিষয় করেছিলেন । নব উদ্বেলিত জাতীয় চেতনার ছোঁয়ায় তাতে অভিনব আকারে অবয়ব ফুটে উঠল । সামাজিক সমস্যা ও বিষয় নিয়ে লিখলেন রাম নারায়ণ তর্করত্ন । প্রহসন কয়েকখানি ব্যঙ্গ কৌতুকও হ'ল রচিত । উনবিংশ শতকের অন্ত্যপাদে মুখ্যতঃ রামকৃষ্ণ রায় ও গিরিশ চন্দ্রের রচনাতে পৌরাণিক বিষয়ের উপর নতুন জোর দেওয়া হয়েছিল । একটা নতুন আবেগের সঞ্চার করেছিল । নতুন ছন্দ- ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে — যাকে কেউ কেউ পরে গৈরিশ ছন্দ বলে অভিহিত করেছেন — সংলাপ রচনা করে তিনি নতুন ভাবাবেগ ও ভক্তি প্লাবনের সৃষ্টি করেন -- যার তরঙ্গ বিংশ শতকে প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলার নাট্যমঞ্চের অন্যতম মুখ্য সুর ছিল । রামায়ণের কাহিনী নিয়ে তিনি রামের বনবাস, সীতা হরণ, রাবণ বধ , সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ- বর্জন, -- প্রমুখ নাটক এবং মহাভারত ও পুরাণ থেকে বিষয় আহরণ করে অভিমন্যু বধ, বৃষকেতু, নলদময়ন্তী, দক্ষযজ্ঞ, জনা, পাণ্ডব গৌরব ইত্যাদি রচনা করে ছিলেন । মহাপুরুষদের চরিত্র নিয়ে লিখিত নাট্যাবলী চৈতন্য লীলা, বুদ্ধদেব চরিত, রূপ সনাতন, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তিরস সঞ্চারের ও প্রচারের মূল আধার হয়েছিলেন । উনবিংশ শতকের অন্ত্যপাদে রাজকৃষ্ণ রায়ও রামের বনবাস, যদু বংশ ধ্বংস অনলে বিজয়া (সীতার অগ্নি পরীক্ষা), তরণী সেন বধ, তারক-সংহার, গঙ্গা মহিমা, বামন ভিক্ষা, ভীষ্মের শরশয্যা প্রমুখ বহু পৌরাণিক নাটক রচনা করেন । প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য যে এই রাজকৃষ্ণ রায় রামায়ণ ও মহাভারতের গদ্যানুবাদ করেছিলেন — তা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে

কাব্য - কবিতা ও নাট্য সাহিত্যের মধ্যে যে ভক্তি ভাবের কার্পণ্য দেখা দিয়েছিল উনবিংশ শতকে — গিরিশচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণের ব্যতিক্রম নাটকাদি বাদ দিলে — এমন একটা ধারণা হওয়া অসম্ভব কল্পনা নয় বলে ধরা যায় কি ? তাহলে বাংলা সাহিত্যে তথা বাঙালী জীবনে ভক্তির আবেগ - স্রোত কি শুকিয়ে গিয়েছিল বা অন্য

ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে পথান্তরে প্রবাহিত হয়েছিল কিংবা ফল্গুর মতো সাহিত্য জীবনের গভীরে প্রবাহিত ছিল ?

আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিষয়ে সাধ্য মতো আলোচনা করব ।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

(ক)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ——

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান ।
আমারে দিয়েছ সুর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান ।

(বলাকা, ২৮)

এই "বেশী" টুকু সুরকে সুরে রূপান্তরিত করা — করার শক্তি ও সাধনাই জীব জগতের মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব ও অবদান ।

এটা বুঝতে গেলে প্রথম মানুষকে মানুষের দেহ - প্রাণ - মন - বুদ্ধিযুক্ত সীমাবদ্ধতাকে এবং তা থেকে তার মুক্তির সংগ্রাম ও সাধনাকে বুঝতে হবে । বিশ্বের তথা জীব জগতের বিবর্তন ও বিকাশ ধারায় মানুষের আবির্ভাব একটি তুঙ্গ সীমা । মেরুদন্ডী, জরায়ুজ, স্তন্যপায়ী এই মানুষ জীবটি দেহের দিক থেকে, সমকালের জৈবিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে আত্মরক্ষার জন্য দন্ত - শৃঙ্গ ও তীক্ষ্ণ নখরাদিসকল শারীরিক অস্ত্র সজ্জা না পেয়েও কেমন করে টিঁকে থাকল, জীবজগতের শীর্ষে নিজের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করল এবং কোন শক্তি বলে করল, করতে পারল সেটি ভেবে দেখা প্রয়োজন ।

জড় — তার পর জীবের অর্থাৎ স্থাবর উদ্ভিদ ও জঙ্গম প্রাণীর আবির্ভাব । নিজ নিজ সীমাবদ্ধ জীবনধারনের পরিমিত শক্তি, স্বভাব এবং নির্দিষ্ট কালে বিশ্বশক্তির ভারসাম্য রক্ষণে এবং নব সৃষ্টির সমন্বিত উন্মেষ সাধনে বিকাশের দিকে যে প্রেরণা বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত — সেই সূত্রে প্রাণের ক্ষেত্র থেকে মনবুদ্ধির ক্ষেত্রে যে উত্তরণ হয়েছে জীবজগতে তার আশ্রয় ও ভাজন মানুষ — কেবল মানুষ, অন্য কোন প্রাণী নয় ।

অতিকায় জীবের মাংসপেশী ও দৈহিক শক্তির প্রাচুর্য আর কীট - পতঙ্গের বংশবৃদ্ধির অজস্রতা — এই দুই প্রান্ত সীমান্তের উপরিস্থিত মানুষের মন-বুদ্ধি-ঐশ্বর্য। জীববিজ্ঞানে মানুষের দেহযন্ত্রটি মেরুদন্ডের নিম্নতম সীমান্ত থেকে একেবারে মস্তিষ্ক পর্যন্ত যে সুশৃঙ্খল প্রকাশ, তা জীবজগতে অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় এক অভিনব সম্পূর্ণতা। আর মানুষের প্রকৃতিগত উদ্ভাবনের আবেগ — তার জিজ্ঞাসা ও চলিষ্ণুতা, সর্বাতিশায়ী জীবন সাধনার বিরামবিহীন প্রয়াস মানুষের, মানবজাতির জন্মলগ্ন অপরিহার্য সংস্কার। মুখ্যতঃ মানুষের জীবন বিকাশ ধারা দ্বিমুখী। বহির্জগৎ ও জীবনকে দেখবার বুঝবার জয় করবার অফুরন্ত সাহস ও অশিথিল উদ্যম একদিকে, অপর দিকে নিজের দেহের মধ্যে, নশ্বর - মরণশীল ভঙ্গুর দেহ-আয়তনের মধ্যে দেহাতীতের, শাশ্বত অবিনশ্বর অমৃতের সন্ধানও তপস্যা। এককথায় বহিরঙ্গ বিজিগীষা ও অন্তরঙ্গ আত্ম জিজ্ঞাসা। জগৎ জিজ্ঞাসা ও আত্মজিজ্ঞাসা — দুই-এ মিলে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। এরই ফলে অর্জিত হয়েছে, নির্মিত হয়ে মানুষের সমাজ - সংস্কৃতি, শিল্প-বিজ্ঞান, ধর্মদর্শন।

(খ)

সুরকে সুরে রূপান্তরিত করার প্রয়াসে প্রথম পদক্ষেপ ভাষা। মানব জীবনের সমুন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ বহিরঙ্গ উপাদান ও আবিষ্কার যেমন অগ্নি, তেমনি অন্তরঙ্গ আশা - আবেগের প্রকাশ - বিকাশে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান ও আবিষ্কার মানুষের ভাষা। অগ্নির তাপ ও আলো দিয়ে বহিরঙ্গ জীবনকে নানা ভাবে নানাদিকে সমৃদ্ধ করেছে মানুষ একদিকে, অপর দিকে ভাব - ভাবনাকে প্রকাশ ও সঞ্চারণের মাধ্যমে আদান-প্রদানে সামাজিক স্তরে অবিনশ্বর সম্ভাবনা ও ঐশ্বর্যের দ্বার খুলে দিয়েছে ভাষা। জীবজগতে ভাষা একমাত্র মানুষেরই নিজস্ব অসপত্ন অভিনব সম্পদ।

কীট - পতঙ্গের মধ্যে পরস্পরের সাহচর্য লাভের জন্য যে নিঃশব্দ সঙ্কেত — বা পশু - পাখী যে নানা আওয়াজের ডাক এগুলিকে কি ভাষার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না? জীবন যাত্রার পক্ষে যে সব শব্দহীন সঙ্কেত বা শব্দযুক্ত ইসারা — তার রাগ - ভয় -

আনন্দ প্রকাশের বিচিত্র ধ্বনিরাশি, তাকেও একজাতীয় ভাষা বলা যায় না কি ?
"সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানও বাংলা ভাষা" — গ্রন্থের প্রণেতা ড: বামেশ্বর শ' মহাশয় তাঁর গ্রন্থারম্ভে ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস এফ্ হকেট্ সাহেবের যে মন্তব্যটি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে এই প্রশ্নটির চমৎকার উত্তর আছে । গোটাটাই উদ্ধার করা যাক্ ——

"From time immemorial, the animals and spirits of Folk-lore have had human characteristics thrust upon them, including always the power of speech. But the cold facts are that Man is the only living species with this power ..... The appearance of language in the universe - at least on our planet - is thus exactly as recent as the appearance of Man himself. ".

আসলে ভাব-ভাবনা মনের সম্পদ, — আর মন আছে কেবল মানুষেরই । অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে প্রাণ রক্ষার জন্য প্রকৃতিদত্ত কিছু যান্ত্রিক সংস্কার —— জন্মলব্ধ এবং একান্তভাবে সীমাবদ্ধ তার অভ্যাসের বাহিরে বিচরণ করবার ক্ষমতা নেই । বানর, ঘোড়া-হাতি-পাখী -বাঘ সার্কাসে যে খেলা দেখায়, সেগুলি মানুষের দ্বারা আরোপিত প্রশিক্ষার যান্ত্রিক ফল — পশু-পাখির স্বাভাবিক বিকাশের পরিণাম নয় ।

ভাষার সংজ্ঞা কী ? ভাষাচার্য ড: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —
"মনের ভাব - প্রকাশের জন্য, বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে ।" (চট্টোপাধ্যায়, ড: সুনীতি কুমার ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ১৯৪২) ।

বিশেষ লক্ষণীয় যে, (১) মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য ভাষা প্রয়োজন । (২) ভাষা নিষ্পন্ন হয় বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির মাধ্যমে । (৩) বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তা সীমাবদ্ধ । (৪) অর্থবহ বাক্যে তার প্রযুক্তি তাই বিভিন্ন জনসমাজের ভাষাও বিভিন্ন ।

(গ)

প্রতিভাষার শব্দসমূহ —— বিশেষ বিশেষ কতগুলির ধ্বনি-অণু দিয়ে গঠিত। এদের নাম বর্ণ। এই বর্ণগুলিও তাদের বিন্যাসক্রম স্বতঃসিদ্ধ মেনে নিতে হয়। কোন ভাষার বর্ণক্রমকেই বদলানো যায় না। কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্রটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ——"সিদ্ধবর্ণো সমাম্নায়ঃ।" (১।১।১) পঞ্চাশৎ বর্ণমালা আছে ভারতীয় আর্য ভাষায়। তা দিয়ে যাবতীয় শব্দ রচিত। বর্ণের চিত্ররূপ লিপি। বর্ণগুলি যথাযথ থাকলেও আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় —— বাংলা, উড়িয়া - হিন্দি - মারাঠী প্রভৃতিতে লিপির আকার বিভিন্ন।

ভাষার মুখ্য তথা একমাত্র অপরিহার্য প্রয়োজন হচ্ছে মনের ভাব - ভাবনাকে প্রকাশ করা। ভাব - ভাবনা কীভাবে ও ক্রমে দেহাভ্যন্তর থেকে বাক্ রূপে প্রকাশিত হয় তার সুষ্ঠু আলোচনা করেছেন আচার্যগণ।

আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে বাক্ শব্দের গুরুত্ব অপরিসীম। বৈদিক সাহিত্যে বলা হয় শব্দ ব্রহ্ম। তান্ত্রিক পরিভাষায় শব্দব্রহ্মের নাম পরা বাক্। যা হোক এবিষয়ে মহামহোপাধ্যায় আচার্য — ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যাক্ ——

"অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে জপ ও ধ্যান দুটি প্রধান। জগৎ রহস্য বুঝিবার পূর্বে শব্দতত্ত্ব অথবা বাক্তত্ত্ব জানা আবশ্যক। শব্দ অথবা বাক্ চারি প্রকার। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী। পরা বাক্ শব্দ-ব্রহ্ম স্বরূপ পরম শিবের সঙ্গে অভিন্ন। উহার বাহ্যস্ফূর্তি তিন প্রকার। প্রথম পশ্যন্তী রূপে দ্বিতীয় মধ্যমা, তৃতীয় বৈখরীরূপে। সমগ্র বিশ্ব বিশ্লেষণ করিলে যোগদৃষ্টিতে তিনটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যোগী-দের সুপরিচিত। একটি শব্দ, আর একটি অর্থ আর তৃতীয়টি জ্ঞান। * * * * * * এই কারণে শব্দ অর্থ জ্ঞান এই তিনেরই পরস্পর সম্বন্ধ আছে। * * * * * বৈখরী অবস্থায় শব্দ ও অর্থ পরস্পর ভিন্ন। শব্দবাচক, অর্থবাচ্য, উভয়ের ভেদ আছে। মধ্যমা অবস্থায় শব্দ ও অর্থ উভয়ের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। পশ্যন্তী অবস্থায় উভয়ের অভেদ সম্বন্ধ —— শব্দ ও অর্থ একই বস্তু, পশ্যন্তী অবস্থায় তিনেরই

পূর্ণ স্বরূপে প্রকাশমান।" — (পরমার্থ প্রসঙ্গে, প্রথম ভাগ মহামহোপাধ্যায় ড: গোপীনাথ কবিরাজ, ১৩৪৮)।

অনাহত নাদরূপ শব্দ ব্রহ্ম বা পরাবাক্ অবস্থিত আছে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূলে নিষ্কল অনির্বচনীয় নির্বিকার - নিরাকার ব্রহ্ম স্বরূপে। মানব দেহ ভাণ্ডে তার স্থিতি মূলাধার চক্রে। উন্মেষের দ্বিতীয় স্তরে পশ্যন্তী -তে শব্দ-অর্থ -জ্ঞান এই তিনটির অভেদ সম্বন্ধে অস্পষ্ট আভাসরূপে স্থিতি। দেহভাণ্ডে মণিপুর চক্রে তার অবস্থান। শাক্ত ভাবনায় ব্রহ্মগ্রন্থি। তৃতীয় স্তর মধ্যমা। এই স্তরে শব্দের ও অর্থের তথা জ্ঞানের ভেদ পরিস্ফুট কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়, কাজেই ভেদাভেদ সম্বন্ধে স্থিত। দেহভাণ্ডে তার অবস্থান অনাহত চক্রে। শাক্ত ভাবনায় বিষ্ণুগ্রন্থি। চতুর্থে, বৈখরী স্তরে শব্দরূপে বাকের প্রকাশ ও পরিণাম। শব্দ ও অর্থ বিভিন্ন হয়েছে। শব্দ বাচক ও অর্থ বাচ্য রূপে ভেদাভেদ সম্বন্ধে ভাষাতে তথা বাক্যে প্রকাশিত। দেহভাণ্ডে তার অবস্থান বিশুদ্ধ চক্রে। শাক্ত ভাবনায় রুদ্রগ্রন্থি। কণ্ঠ থেকে উৎগীর্ণ হয়ে অর্থের দ্যোতনা করে, বাক্ বাক্যে পরিণত হয়।

(ঘ)

বৈখরীর মধ্য দিয়ে বাক্ -এর যে বাক্য পরিণাম অর্থাৎ ভাষা — তার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে। বেদের মন্ত্রসমূহকে সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে সম্পাদনা করেছিলেন — মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের বচন ——

পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশভাগ কলয়া বিভু:।
অবতীর্ণো মহাভাগো বেদংচক্রে চতুর্বিধম্ ॥' (১২।৬।৪৯)

এই থেকে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদবিভাগ করে হলেন বেদব্যাস। সংহিতা - ব্রাহ্মণ - আরণ্যক, উপনিষদ্ এই চতুরংশ নিয়ে বেদ। ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব, এই চার বিভাগের মধ্যেই সংহিতাদি ক্রমে স্বতন্ত্র বিভাজন হয়েছে। বেদকে বলা হয়

ত্রয়ী। অথর্ববেদের মধ্যে — অথর্ব ও আঙ্গিরস নামে ঋষিদ্বয় আধিদৈবিক যজ্ঞক্রিয়াদি অপেক্ষা আধিভৌতিক লৌকিক ও মাঙ্গলিক কর্মের দিকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অথর্ব বেদের প্রাচীন নামও অথর্বাঙ্গিরস। যাহোক যজ্ঞাদি মুখ্যকর্মে এবং কোন নির্দিষ্ট বৈদিক কর্মে প্রয়োগ স্থান না থাকায় অথর্ব বেদ অনুল্লিখিত এবং ঋক্ সাম যজু এই তিন বেদেরই মন্ত্র প্রযুক্তির জন্য বোধ হয় ত্রয়ী নামে পরিচিত হয়েছিল বেদ।

যা হোক ঋক্ বেদাদি সংহিতার সূক্তগুলি স্তুতি প্রধান। তার যেসব স্তুতি গীতিরূপে গীত হয় তার নাম সামবেদ। কৌথুমী শাখার সামবেদ সংহিতায় সঙ্কলিত আছে ১৫৪১টি ঋক্ মন্ত্র, তারমধ্যে ৭৫টি বাদ দিলে (যেগুলি সামবেদেরই নিজস্ব মন্ত্র) বাকি ১৪৭৪টি মন্ত্র ঋক্ - সংহিতারই অন্তর্ভুক্ত। সায়ণ আচার্য বলেছেন —— "গীতিরূপেণ ত্রাসামানি"। বৈদিক সাহিত্যের অন্যতম আধুনিক পণ্ডিত ডঃ যোগীরাজ বসুর মূল্যবান মন্তব্যটি উদ্ধার করা যাক্ ——"সামবেদই আর্য - সঙ্গীতের উৎস। সাম শব্দে সর্বদায়, গান বোঝায়। ঋক্ মন্ত্রে সাতটি সুর লীলায়িত করিয়া সামগান করা হইত। * * * * এখন সপ্ত সুরকে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত, ও নিষাদ বা সংক্ষেপে প্রত্যেকটির প্রথম অক্ষর লইয়া সা (ষা) রি (ঋ) গা, মা, পা, ধা, নি বলা হয়। সাম বেদের যুগে এই সপ্ত সুরের নাম ছিল ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ মন্দ্র ও অতিস্বার্য। নারদ নামে একটি বৈদিক শিক্ষার (Phonetics) গ্রন্থকার এবং বেদভাষ্যকার সায়ণ সাম বেদের সপ্ত সুরকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম নামে অভিহিত করিয়াছেন।" (বেদের পরিচয় ডঃ যোগীরাজ বসু, প্রথম সংস্করণ, কার্তিক, ১৩৭৭)

হরফ প্রকাশিত সামবেদ সংহিতা গ্রন্থের সম্পাদক শ্রী পরিতোষ ঠাকুর মহাশয়ের তত্ত্বগর্ভ মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য ——

''যা শব্দ করে তা সুর, আর সূর্য ওঁ শব্দ করে ভ্রমণ করে বলে সূর্যই সুর। * * * ওঁ উচ্চারণ করে সাম গান করা হয়। সেই সাম গান সূর্যকে ঘিরে হয়। সা = প্রকৃতি বা অদীপ্তা অক্ষয়া ঐশী শক্তি ; অম্ = আত্মা, যা সূর্য মণ্ডলের মধ্যে আসীন। সুতরাং সূর্যরূপ জগতের আত্মার সঙ্গে যা ওতপ্রোত তা

সাম। আর যেহেতু ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা সাম গান করা হয় সেহেতু ঋক্ই সাম এবং সামই সূর্য। আর যেহেতু সূর্য-ই সাম ও ওঙ্কার এবং সূর্যই প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত সুতরাং প্রাণ ও ওঁ উচ্চারণ করে জীবদেহেই বিচরণ করে। * * * * সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সামের আশ্রয় সুর, সুরের আশ্রয় প্রাণ, প্রাণের আশ্রয় অন্ন, অন্নের আশ্রয় জল, জলের আশ্রয় পুনরায় সুর বা আদিত্য যাকে ঘিরে জল সদা বর্ত্তমান। সুতরাং সুর বা সুর লোকের অথবা স্বর্গলোকের অতীত আশ্রয়ান্তরে আমাদের কেউ নিয়ে যেতে পারে না।" (হরফ প্রকাশনীর — সামবেদ সংহিতা গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীপরিতোষ ঠাকুর। প্রথম প্রকাশ ১৭ই আশ্বিন ১৩৮২)

মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সঙ্গীতের সুরধ্বনি ধারা বৈদিক যুগ থেকে সামবেদ রূপ সোমুখ থেকে উৎসারিত হয়ে ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্র ও সাধনাকে সর্বতোমুখী সমুন্নতির মোহনার দিকে প্রবাহিত করেছে। বেদশাখাগুলির মধ্যে সাম বেদের সমধিক গুরুত্ব স্বীকৃত। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন — "বেদানাং সামবেদোঽস্মি।" তাছাড়া সঙ্গীত চর্চার জন্য স্বতন্ত্রভাবে গন্ধর্ব বেদ নামে একটি উপবেদের উদ্ভব হয়েছিল এবং এটির প্রণেতা ছিলেন ভরত। সাহিত্যের ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন —— "গীতিকাব্যগুলি তান - লয় যোগে গীত হইত। বিশেষত রামায়ণ - মহাভারতাদি যে গীত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া লব - কুশ দ্বারা অযোধ্যার রাজসভায় গান করাইয়াছিলেন এবং কথিত আছে ভরতাচার্যই উহা সুর - লয় সংযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু কি সুর - লয়ে উহা গীত হইত তাহা জানিবার উপায় নাই। মেঘদূত, মোহমুদ্গর প্রভৃতি গীতিকাব্য অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীর গীতগোবিন্দ সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব গীতিকাব্য।" (সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস শ্রী জাহ্নবী চরণ ভৌমিক এম, এ, বি এল লিখিত এবং ডঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা সহ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, রথযাত্রা, ১৩৮২)।

অতএব, বাক্যে চরম প্রকাশ হয়েছে কাব্যে — সুর যুক্ত গীতের মধ্যে। কথা ও সুরযুক্ত গীতিকাব্য তথা গানই যে মানুষের ভাব - ভাবনা, হৃদয়াবেগ ও বোধবুদ্ধির পরম আনন্দময় রসসমৃদ্ধ উৎসার তাতে সন্দেহ নেই।

(৩)

সুর বা সুরযুক্ত কথার উৎস এবং তার গুরুত্ব ও সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার অবদান সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, এবার তার মর্মার্থটি উৎঘাটন করে আলোচনার ইতি টানা যাক্। মানুষের ভাষা-সাহিত্য তথা জীবন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরম রূপটি প্রকাশিত হয়েছে কথা ও সুরযুক্ত সঙ্গীতের মধ্যে। স্তোত্র-সাহিত্যের পরমতম ও অন্তরতম রূপটি একমাত্র গীতের মধ্যে পাওয়া সম্ভব। আর গীতের ব্যাপকতা ও গভীরত্ব কী আধ্যাত্মিক কী সামাজিক সর্ব স্তরই — গীতিমহিমা তার ঐশ্বর্য ও গৌরব তথা প্রভাব প্রতিপত্তি অপরিসীম।

সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যের পরিচয় পর্যালোচনা এবং বাংলা ভক্তি সাহিত্যের সহিত তার কি সম্বন্ধ এবং কিভাবে স্তুতিগীতে তার পর্যবসান হয়েছে সে সম্বন্ধে আর নূতন বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করে মহাসাধক ব্রহ্মর্ষি শ্রী শ্রী সত্যদেব রচিত — "সাধন - সমর" গ্রন্থ থেকে একটি অংশ উদ্ধার করে সমগ্র আলোচনার উপসংহারে আসা যাক্। "স্তুতি দুই প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। এক আর্তের স্তুতি, অপর কৃতজ্ঞতার স্তুতি। এক বিপদে পড়িয়া, অপর অভীষ্ট সিদ্ধির পর। এই উভয়বিধ স্তুতির দ্বারা প্রায় সকল ধর্মশাস্ত্রেরই অর্ধাঙ্গ পরিপূর্ণ। স্তুতির যে কি অপূর্ব শক্তি, তাহা মন্ত্রচৈতন্যকারী সাধকগণ একবার মাত্র পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। যতদিন মন্ত্রসমূহ চৈতন্যযুক্ত না হয় — রস ও ভাব সমন্বিত না হয়, ততদিন স্তোত্রাদি পাঠের ফল অতি সামান্য মাত্র — ততদিন উহার প্রত্যক্ষ ফল অনুভূতিযোগ্য হয় না। বিক্ষিপ্তচিত্ত সাধকগণের পক্ষে ধ্যানের ভাণ অপেক্ষা স্তোত্র পাঠ উৎকৃষ্টতর প্রার্থনা। কারণ ধ্যান করিতে হয় না — উহা আপনি আসে। অপ্রত্যক্ষ বস্তুর ধ্যানই হয় না। যখন যা আসেন তখন তিনি প্রত্যক্ষযোগ্য হন, তখনি সাধক আত্মহারা হইয়া, মুখনেত্রে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়ে। ইহারই নাম ধ্যান। অনেকে মনে করেন — স্তোত্র পাঠ বহিরঙ্গ সাধনা, সুতরাং পরিত্যাজ্য। অবশ্য যাহাদের সর্বদা ধ্যানাবস্থা আসিয়াছে, যাঁহাদের চিত্ত একাগ্র ও নিরোধ ভূমিক হইয়াছে, মাত্র তাঁহারাই এককথা বলিতে পারেন। বর্তমান যুগের মহাপুরুষ আচার্য শঙ্কর এবং মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবও

কিন্তু ইচ্ছাপূর্বকই হউক আর লোকহিতৈষণা প্রযুক্তই হউক বিক্ষিপ্ত চিত্তের আদর্শটি নিয়াছিলেন । * * * * যাহা হউক ধ্যানের ভাণ অপেক্ষা স্তোত্রপাঠ যে শীঘ্র ফলপ্রদ ইহা অনেকস্থলে পরীক্ষা করিয়াও দেখা গিয়াছে । স্তোত্র-পাঠ সাধককে যত শীঘ্র ধ্যানাবস্থায় আনয়ন করে, ধ্যানের ভাণ তত শীঘ্র করে না । বেদান্তশাস্ত্রে যাহাকে মনন বলে, যোগশাস্ত্রে যাহাকে ধারণা বলে স্তোত্র পাঠ তাহারই অন্তর্গত ।" (সাধন সমর বা দেবীমাহাত্ম্য, ২য় খন্ড, ব্রহ্মর্ষি শ্রী সত্যদেব রচিত, ১৩৬১) ।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট — ক

নির্বাচিত স্তোত্র সংকলন

স্তোত্র - সাহিত্য সে-ই বৈদিক যুগ থেকে উৎসারিত হয়ে ভক্তি-রসধারায় একেবারে সমকালের বাঙালী তথা ভারতীয় সাহিত্যে ও জীবনে কেবল বিপুল বিস্তৃতি লাভই করে নি, ভক্তি - রস - সুরধনীর নিত্য-তোয়া সুধারসে অমৃতময় - আনন্দময় করে তুলেছে। মূল প্রবন্ধের পাঁচটি অধ্যায়ে যথাসাধ্য তার আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিশিষ্টাংশে নির্বাচিত সংস্কৃত ও বাংলা স্তবাদি চয়ন করে তার বহিরঙ্গ বৈচিত্র্য ও অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের একটি সুস্পষ্ট আলেখ্য সুলায়তনে অঙ্কিত করা হল। এই সংকলনে দুটি পর্ব। প্রাক্ পর্বে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আর উত্তর পর্বে বাংলা - সাহিত্য থেকে স্তোত্রসমূহ আহরণ করা হয়েছে। প্রাক্ পর্বে আছে — বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, তন্ত্র ও মহাপুরুষবর্গের রচিত কয়েকটি স্তোত্রসম্ভার আর উত্তর পর্বে বাংলা সাহিত্য ভান্ডার থেকে সমাহৃত স্তোত্র-সঙ্গীতের উপহার।

উভয় পর্বেই আহরণের প্রয়াস হয়েছে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। মূল রচনার অধ্যায়গুলিতে আলোচনা প্রসঙ্গে স্তোত্রাদির অনেক উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে। এখানে যথাসম্ভব পুনরাবৃত্তি পরিহার করে স্তোত্রাদি চয়নের প্রচেষ্টা হয়েছে। বিষয় ও ভাবের বৈশিষ্ট্য এবং রচনা আঙ্গিকের বৈচিত্র্য উভয় দিকেই দৃষ্টি রেখে পরিচিত স্তোত্রাদির যথাসম্ভব প্রাধান্য প্রদানের প্রয়াস হয়েছে। স্তোত্র সংখ্যা যেখানে সমধিক যেমন সংস্কৃত সাহিত্যে — সেখানে স্থানাভাবহেতু নির্বাচনীক্ষেত্রে অসহায় কার্পণ্যদোষে দুষ্ট হতে হয়েছে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দিকে বিশেষ নজর রাখতে গিয়ে অনেক মূল্যবান স্তোত্র সংযোজন করা যায় নি, কাজেই একটি বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন যে, বিভিন্নভাব ও আঙ্গিকের বহুমুখী রচনার এই অংশ একটি প্রদর্শনী মাত্র।

প্রাক্ পর্বে সংস্কৃত সংকলন অংশে — বৈদিক সাহিত্য অর্থাৎ সংহিতা, উপনিষদ্, তন্ত্র, পুরাণ ও আচার্যগণের রচনাভান্ডার থেকে নিদর্শন চয়িত হয়েছে। বিভিন্ন ভাব - বৈচিত্র্যের নিদর্শন হিসাবে বৈদিক - সাহিত্যে সংহিতা অংশে দেবতাদের মধ্যে কেবল অগ্নি,

ইন্দ্র, বিশ্বদেবগণ, পৃথিবী ও রুদ্র এবং উপনিষৎ থেকে মহেশ্বর স্তুতি পরিগৃহীত হ'ল। তন্ত্র, পুরাণে নানা বৈশিষ্ট্য বিধায়ক নমুনা প্রদর্শিত হয়েছে, যেমন — অ-কারাদি ও ক-কারাদি, চৌত্রিশা, শতনাম ইত্যাদি। গীতা, চণ্ডী, মহাভারত, প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে স্তব আহরণ ব্যতীত " স্বাধ্যায় নামক" একটি স্বতন্ত্র অংশে স্তুতিবচনাদির একটি নমুনা সংকলন রচিত হয়েছে।

উত্তর পর্বে বাংলা মঙ্গলকাব্য, অনুবাদকাব্য, শ্রীচৈতন্য - ভাগবত ও ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য থেকে নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা স্তবাদির মধ্যে চৌত্রিশা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্তব-মালিকা। চৌত্রিশাদি স্তবের ভাণ্ডারে বহুবিধ স্তবাদি থাকা সত্ত্বেও স্থানাভাবের জন্য লোভ প্রশমিত করতে বাধ্য হতে হ'ল।

উৎসমূলে হৃদয়ের আকুতি স্তোত্রাকারে উৎসারিত হয়ে মোহনাতে একেবারে সঙ্গীতের মধ্যে - সুরের মধ্যে সমর্পিত হয়েছে। স্তোত্রের পরিণতি হয়েছে গানে। তাই মধ্যযুগের নমুনা - সংগ্রহে অসুবিধা কিছুটা কম হলেও আধুনিক কালের রচিত ভক্তি- সঙ্গীতগুলির মধ্য থেকে চয়ন করা অধিকতর কঠিন হয়েছে।

আর একটি অসুবিধা এই যে, উনবিংশ শতক পর্যন্ত আমাদের আলোচনা-সীমা নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু বাংলা ভক্তি - সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই এই সীমা সঙ্গতভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে বারবার, যেমন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র ভক্তি-সঙ্গীতের যে কুঁড়িটি উনবিংশ শতাব্দীতে মাথা তুলেছিল তার পরিপূর্ণ প্রস্ফুটন হয়েছিল — বিংশ শতকের রবীন্দ্রনাথের — গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি ইত্যাদি গ্রন্থের মধ্যে। এখানে কি কাল- সীমা লঙ্ঘন করার অপরাধে কি অভিযুক্ত হব ? ভক্তি - সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতকে জন্ম গ্রহণ করে যাঁরা বিংশ শতক পর্যন্ত সাহিত্য-সঙ্গীতক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন সগৌরবে তাঁদের রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ কবির গানও পরিহার করতে পারিনি। কালের হিসাব আর রসাস্বাদনের হিসাব যদি সমমাত্রায় না আসে তবে আমরা কোন্ দিকে প্রাধান্য দিব ? কালাবচ্ছিন্ন রসধারার না কালশাসিত খণ্ডিত ঐতিহাসিক ধারার ? আমরা রস-ধারাকেই প্রাধান্য দিলাম।

বৈদিক সাহিত্য

(ক) সংহিতা

অগ্নি স্তোত্র

অগ্নি দেবতা । মধুচ্ছন্দা ঋষি ।

গায়ত্রী ছন্দ

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ১
অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত
স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২
অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে ।
যশসং বীরবত্তমম্ ॥ ৩
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি ।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৪
অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ ।
দেবো দেবেভির্যা গমৎ ॥ ৫
যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি ।
তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥ ৬
উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্ ।
নমো ভরন্ত এমসি ॥ ৭
রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্ ।
বর্ধমানং স্বে দমে ॥ ৮
স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব ।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯

ঋগ্বেদ সংহিতা

ঋগ্বেদ ১ম সূক্ত ।

ঋগ্বেদ - সংহিতা — ইন্দ্রস্তুতি

বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি । গায়ত্রীছন্দ

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে । জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১
উপ: নর সবনা গহি সোমস্য সোমপা: পিব । নোদা ইন্দ্রেবতো মদ: । ২
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাং । মা নো অতি খ্য আ গহি ॥ ৩
পরহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছা বিপশ্চিতং । যস্তে সখিভ্য আ বরম্ ॥ ৪
উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরন্যশ্চিদারত । দধানা ইন্দ্র ইদ্দুব: ॥ ৫
উন ন: সুভগাঁ অরির্বোচেয়ুদস্য কৃষ্টয়: । স্যামেদিন্দ্রস্য শর্মণি ॥ ৬
এমাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনং । পতয়ন্মন্দ্রয়ৎসখং ॥ ৭
অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভব: । প্রাবো বাজেষু বাজিনম্ ॥ ৮
তং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়াম: শতক্রতো । ধনানামিন্দ্র সাতয়ে ॥ ৯
যো রায়োঽবনির্মহান্ত্সুপার: সুন্বত: সখা । তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ১০

ঋগ্বেদ — সংহিতা — ঋগ্বেদ - প্রথম মন্ডল

৪ সূক্ত ॥

বিশ্বদেবগণ স্তুতি ।

বসিষ্ট ঋষি । ত্রিষ্টুপ ছন্দ ।

শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভি: শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা ।
শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং যো: শং ন ইন্দ্রপূষণা বাজসাতৌ ॥ ১
শং নো ভগ: শমু ন: শংসো অস্তু শং ন: পুরন্ধি: শমু সন্তু রায়: ।
শং ন: সত্যস্য সুযমস্য শংস: শং নো অর্যমা পুরুজাতো অস্তু ॥ ২
শং নো ধাতা শমু ধর্তা নো অস্তু শং ন উরূচী ভবতু স্বধাভি: ।
শং রোদসী বৃহতী শং নো অদ্রি: শং নো দেবানাং সুহবানি সন্তু ॥ ৩
শং নো অগ্নির্জ্যোতিরনীকো অস্তু শং নো মিত্রাবরুণাবশ্বিনা শম্ ।
শং ন: সুকৃতাং সুকৃতানি সন্তু শং ন ইষিরো অভি বাতু বাত: ॥ ৪
শং নো দ্যাবাপৃথিবী পূর্বহূতৌ শমন্তরিক্ষং দৃশয়ে নো অস্তু ।
শং ন ওষধীর্বনিনো ভবন্তু শং নো রজসস্পতিরস্তু জিষ্ণু: ॥ ৫

শং ন ইন্দ্রো বসুভির্দেবো অস্তু শমাদিত্যেভির্বরুণঃ সুশংসঃ ।
শং নো রুদ্রো রুদ্রেভির্জলাষঃ শং নস্ত্বষ্টা গ্নাভিরিহ শৃণোতু ॥ ৬
শং নঃ সোমো ভবতু ব্রহ্ম শং ন শং নো গ্রাবাণঃ শমু সন্তু যজ্ঞাঃ ।
শং নঃ স্বরূণাং মিতয়ো ভবন্তু শং ন প্রস্বঃ শমুস্তু বেদিঃ ॥ ৭
শং নঃ সূর্য উরুচক্ষা উদেতু শং নশ্চতস্রঃ প্রদিশো ভবন্তু ।
শং নঃ পর্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু শং নঃ সিন্ধবঃ শমু সন্ত্বাপঃ ॥ ৮
শং নো অদিতির্ভবতু ব্রতেভিঃ শং নঃ ভবন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ ।
শং নো বিষ্ণুঃ শমু পূষা নো অস্তু শং নো ভবিত্রং শমুস্তু বায়ুঃ ॥ ৯
শং নঃ দেবঃ সবিতা ত্রায়মাণঃ শং নো ভবন্তূষসো বিভাতীঃ ।
শং নো পর্জন্যো ভবতু প্রজাভ্যঃ শং নঃ ক্ষেত্রস্য পতিরস্তু শম্ভুঃ ॥ ১০
শং নো দেবা বিশ্বদেবা ভবন্তু শং সরস্বতী সহ ধীভিরস্তু ।
শমভিষাচঃ শমুঃ রাতিষাচঃ শং নো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ শং নো অপ্যাঃ ॥ ১১
শং নঃ সত্যস্য পতয়ো ভবন্তু শং নো অর্বন্তঃ শমু সন্তু গাবঃ ।
শং ন ঋভবঃ সুকৃতঃ সুহস্তাঃ শং নো ভবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ১২
শং নো অজ একপাদ্দেবো অস্তু শং নোঽহির্বুধ্ন্যঃ শং সমুদ্রঃ ।
শং নো অপাং নপাৎপেরুরস্তু শং নঃ পৃশ্নির্ভবতু দেবগোপাঃ ॥ ১৩
আদিত্যা রুদ্রা বসবো জুষন্তেদং ব্রহ্ম ত্রিষুমাণং নবীয়ঃ ।
শৃণ্বন্তু নো দিব্যাঃ পার্থিবাসো গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ১৪
যে দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য বয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১৫

ঋগ্বেদ সংহিতা — ৭ম মণ্ডল

পৃথিবী - স্তুতি

সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি ।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু ॥ ১

অসম্বাধং বধ্যতো মানবানাং যস্যা উদ্বতঃ প্রবতঃ সমং বহু ।
নানাবীর্যা ওষধীর্যা বিভর্তি পৃথিবী নঃ প্রথতাং রাধ্যতাং নঃ ॥ ২
যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্ভূবুঃ ।
যস্যামিদং জিন্বতি প্রাণদেজৎ সা নো ভূমিঃ পূর্বপেয়ে দধাতু ॥ ৩
যস্যাশ্চতস্রঃ প্রদিশঃ পৃথিব্যা যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্ভূবুঃ ।
যা বিভর্তি বহুধা প্রাণদেজৎ সা নো ভূমির্গোষ্বপ্যন্নে দধাতু ॥ ৪
যস্যাং পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রিরে যস্যাং দেবা অসুরানভ্যবর্তয়ন্ ।
গবামশ্বানাং বয়সশ্চ বিষ্ঠা ভগং বর্চঃ পৃথিবী নো দধাতু ॥ ৫
তবশুদ্ধরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী ।
শৈলরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু ॥ ৬

অথর্ববেদ — দ্বাদশ কাণ্ড
প্রথম অনুবাক
প্রথম সূক্ত

রুদ্রস্তুতি

নমস্তে রুদ্র মন্যব উতো ত ইষবে নমঃ । নমস্তে অস্তু ধন্বনে বাহুভ্যামুত তে নমঃ ॥ ১ যা ত ইষুঃ শিবতমা শিবং বভূব তে ধনুঃ । শিবা শরব্যা যা তব তয়া নো রুদ্র মৃড়য় ॥ ২ যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভি চাকশীহি । যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে ॥ ৩ শিবাং গিরিত্রতাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ । শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছা বদামসি ॥ ৪ যথা নঃ সর্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ । অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্ ॥ ৫ অহীংশ্চ সর্বান্ জম্ভয়ন্ৎ সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ । অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ ॥ ৬ যে চেমাং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোঽবৈষাং হেড় ঈমহে । অসৌ যো বসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ ॥ ৭ উতৈনং গোপা অদৃশন্নদৃশন্নুদহার্য্যঃ উতৈনং বিশ্বা ভূতানি স দৃষ্টো মৃড়য়াতি নঃ । নমো অস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢ়ুষে ॥ ৮ অথো যে অস্য সত্বানোঽহং তেভ্যো করং নমঃ । প্র মুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরার্ত্নিয়োর্জ্যাম্ ॥ ৯

যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তা ভগবো বপ । অবতত্য ধনুস্ত্বং সহস্রাক্ষ শতেষুধে ॥ ১০
নিশীর্য্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ সুমনা ভব । বিজ্যং ধনুঃ কপর্দ্দিনো বিশল্যো
বাণবৎ উত ॥ ১১ অনেশন্নস্যেষব আভুরস্য নিষঙ্গধিঃ । যা তে হেতির্মীঢুষ্টম হস্তে
বভূব তে ধনুঃ ॥ ১২ তয়াহস্মান্বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্মযা পরি বভুজ । নমস্তে অস্ত্বায়ুধায়ানা -
তায় ধৃষ্ণবে ॥ ১৩ উভাভ্যামুত তে নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে । পরি তে ধন্বনো
হেতির - স্মান্বৃণক্তু বিশ্বতঃ ॥ ১৪ অথো য ইষুধিস্তবারে অস্মন্নি ধেহি তম্ ॥
(কৃষ্ণযজুর্বেদীয় — সংহিতার রুদ্রস্তুতি থেকে চয়িত ।)

রুদ্রস্তুতি

১। নমো হিরণ্যবাহবে সেনান্যে দিশাংচপতয়ে নমো,
নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যঃ পশূনাম্ পতয়ে নমো ।
নমো গণিপঞ্জরায় ত্বিষীমতে পথীনাং পতয়ে নমো,
নমো হরিকেশায়োপবীতিনে পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ ॥ ৫।১৭

২। নমো রোহিতায় স্থপতয়ে বৃক্ষাণাম্ পতয়ে নমো,
নমো ভুবন্তয়ে বারিবস্কৃতায়ৌষধীনাম্ পতয়ে নমো ।
নমো মন্ত্রিণে বাণিজায় কক্ষাণাম্ পতয়ে নমো,
নম উচ্চৈর্ঘোষায়াক্রন্দয়তে পত্তীনাম্ পতয়ে নমঃ ॥ ৫।১৯

৩। নমঃ কৃৎস্নায়তয়া ধাবতে সত্ত্বনাম্ পতয়ে নমো,
নমঃ সহমানায় নিব্যাধিন আব্যাধিনীনাং পতয়ে নমো ।
নমো নিষঙ্গিণে কক্ষুভায় স্তেনানাং পতয়ে নমো,
নমো নিচেরবে পরিচরায়ারণ্যানাং পতয়ে নমঃ ॥ ৫।২৩

৪। নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো,
নমো শ্বেভ্যোঽশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো ।
নমো আব্যাধিনীভ্যো বিবিধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমো,
নম উগণাভ্যস্তৃংহতীভ্যশ্চ বো নমো ॥ ৫।২৪

৫। নমো গণেভ্যো গণপতিভ্যশ্চ বো নমো,
নমো ব্রাতেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো।
নমো গৃৎসেভ্যো গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমো,
নমো বিরূপেভ্যো বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমো ॥ ৫।২৫

৬। নমঃ সেনাভ্যঃ সেনানিভ্যশ্চ বো নমো,
নমো রথিভ্যো অরথেভ্যশ্চ বো নমো।
নমঃ ক্ষত্তৃভ্যঃ সংগৃহীতৃভ্যশ্চ বো নমো,
নমো মহদ্ভ্যো অর্ভকেভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ৫।২৬

৭। নমঃ কপর্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ নমঃ,
সহস্রাক্ষায় চ শতধন্বনে চ নমো।
গিরিশয়ায় শিপিবিষ্টায় চ নমো,
মীঢ়ুষ্টমায় চেষুমতে চ ॥ ৫।২৯

৮। নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ নমো,
বৃহতে চ বর্ষীয়সে চ নমো।
বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ নমো —
অগ্র্যায় চ প্রথমায় চ ॥ ৫।৩০

৯। নমো বন্যায় চ কক্ষায় চ নমঃ
শ্রবায় চ প্রতিশ্রবায় চ নমঃ।
আশুষেনায় চাশুরথায় চ নমঃ,
শূরায় চাবভেদিনে চ নমঃ ॥ ৫।৩৪

১০। নমো স্তু রুদ্রেভ্যো যে দিবি যেষাং বর্ষমিষবঃ।
তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্ধ্বাঃ ॥
তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু।
তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৫।৬৪

১১। নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যেঽন্তরিক্ষে যেষাং বাত ইষবঃ ।
তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোর্ধ্বাঃ ॥
তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং
দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৫।৬৫

১২। নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে পৃথিব্যাং যেষামন্নমিষবঃ ।
তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোর্ধ্বাঃ ॥
তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু ।
তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৫।৬৬

(শুক্লযজুর্বেদীয় – রুদ্রাধ্যায়, পঞ্চমাধ্যায় রুদ্রস্তুতি থেকে নির্বাচিত)

(খ) উপনিষদ্

মহেশ্বর স্তোত্র

১॥ য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি ।
বিচৈতিচান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪।১

২॥ তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥ ৪।২
ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৪।৩

৩॥ নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে যতো যাতানি ভুবনানি বিশ্বঃ । ৪।৪

৪॥ অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৪।৫

৫॥ মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥ ৪।৬

৬॥ যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪।৭

৭॥ স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥ ৪।৮

৮॥ এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।
হৃদা মনীষামনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৪।৯

৯॥ যদাহতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪।১০

১০॥ একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৫।১

১১॥ সর্বা দিশ ঊর্ধ্বমধশ্চ তির্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্ ।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৫।২

১২॥ যশ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্বান পরিণাময়েদ্ যঃ ।
সর্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ ॥ ৫।৩

১৩॥ তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ৬।১

১৪॥ নতস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৬।২

১৫॥ একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ৬।৩

১৬॥ একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি ।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ৬।৪

১৭॥ নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ৬।৫

১৮॥ একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৬।৬

১৯॥ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥ ৬।৭

২০॥ যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ৬।৮
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৪থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ অধ্যায় থেকে চয়িত ।
ঋ

যুধিষ্ঠির কর্তৃক – শ্রীদুর্গা স্তব (১)

১। যশোদাগর্ভসম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্ ।
নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্দ্ধিনীম্ ॥

২। কংসবিদ্রাবণকরীমসুরাণাং ভয়ঙ্করীম্ ।
শিলাতটবিনিক্ষিপ্তামাকাশং প্রতিগামিনীম্ ॥

৩। বাসুদেবস্য ভগিনীং দিব্যমাল্যবিভূষিতাম্ ।
দিব্যাম্বরধরাং দেবীং খড়্গ খেটকধারিণীম্ ॥

৪। ভারাবতরণে পুণ্যে যে স্মরন্তি সদা শিবাম্ ।
তান্ বৈ তারয়সে পাপাৎ পঙ্কে গামিব দুর্বলাম্ ॥

৫। স্তোতুং প্রচক্রমে ভূপো বিবিধৈঃ স্তোত্রসম্ভবৈঃ ॥
আমন্ত্র্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাজা দেবীং সহানুজঃ ॥

৬। নমোঽস্তু বরদে কৃষ্ণে কুমারি ব্রহ্মচারিণি ।
বালার্কসদৃশাকারে পূর্ণচন্দ্রনিভাননে ॥

৭। চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্রে পীনশ্রোণীপয়োধরে ।
ময়ূরপিচ্ছবলয়ে কেয়ূরাঙ্গদধারিণি ॥

৮। ভাসি দেবি যথা পদ্মা নারায়ণ পরিগ্রহা ।
স্বরূপং ব্রহ্মচর্যঞ্চ বিশদং তব খেচরি ।
কৃষ্ণচ্ছবি সমা কৃষ্ণা সঙ্কর্ষণনিভাননা ॥

৯। বিভ্রতী বিপুলৌ বাহু শঙ্খধ্বজসমুচ্ছ্রয়ৌ ।
পাত্রী চ পঙ্কজী ঘন্টা স্ত্রী বিশুদ্ধা চ যা ভুবি ॥

১০। পাশং ধনুর্মহাচক্রং বিবিধান্যায়ুধানি চ ।
কুণ্ডলাভ্যাং সুপুণ্যাভ্যাং কর্ণাভ্যাঞ্চ বিভূষিতা ॥

১১। চন্দ্র বিম্বধিনা দেবি মুখেন ত্বং বিরাজসে ।
মুকুটেন বিচিত্রেণ কেশবন্ধেন শোভিনা ॥

১২। ভুজঙ্গাভোগবাসেন শ্রোণিসূত্রেণ রাজতা ।
ভ্রাজসে চাপবিদ্ধেন ভোগেনেবেহ মন্দরঃ ॥

১৩। ধ্বজেন শিখি পিচ্ছানামুচ্ছ্রিতেন বিরাজসে ।
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পালিতং ত্বয়া ॥

১৪। তেন ত্বং স্তূয়সে দেবি ত্রিদশৈঃ পূজ্যসেঽপি চ ।
ত্রৈলোক্য রক্ষণার্থায় মহিষাসুরনাশিনি ॥

১৫। প্রসন্ন মে সুরশ্রেষ্ঠে দয়াং কুরু শিবা ভব ।
জয়াং ত্বং বিজয়া চৈব সংগ্রামে চ জয়প্রদা ॥

১৬। মমাপি বিজয়ং দেহি বরয়ে ত্বাঞ্চ সাম্প্রতম্ ।
বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্ ॥

১৭। কালি কালি মহাকালি সীধুমাংসপশুপ্রিয়ে ।
কৃতানুযাত্রাভূতৈস্ত্বং বরদে কামচারিণি ॥

১৮। তারাবতারে যে চ ত্বাং সংস্মরিষ্যন্তি মানবাঃ ।
প্রণমন্তি চ যে ত্বাং হি প্রভাতে চ নরা ভুবি ॥

১৯। ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎ পুত্রতো ধনতোঽপি বা ।
দুর্গাস্তারয়সে দুর্গে তত্ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ ॥
২০। ভক্তানাং রক্ষণার্থায় আবির্ভবসি সর্বদা ।
কান্তারেষ্ববসন্নানাং মগ্নানাঞ্চ মহার্ণবে ॥
২১। দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্ ।
জলপ্রতরণে চৈব কান্তা বষ্টবীষু চ ।
যে স্মরন্তি মহাদেবি ন চ সীদন্তি তে নরাঃ ॥
২২। ত্বং কীর্তি শ্রী ধৃতিঃসিদ্ধিহ্রীর্বিদ্যা সন্ততির্মতিঃ ।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা নিদ্রা জ্যোৎস্না কান্তিঃ ক্ষমা দয়া ॥
২৩। নৃণাঞ্চ বন্ধনং মোহং পুত্রনাশং ধনক্ষয়ম্ ।
ব্যাধিং মৃত্যুং ভয়ঞ্চৈব পূজিতা নাশয়িষ্যসি ॥
২৪। সোঽহং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ শরণং ত্বাং প্রপন্নবান্ ।
প্রণতশ্চ যথা মূর্ধা তব দেবি সুরেশ্বরি ॥
২৫। ত্রাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি সত্যে সত্যা ভবস্ব নঃ ।
শরণং ভব নো দুর্গে শরণ্যে ভক্তবৎসলে ॥
মহাভারতের বিরাটপর্বে অজ্ঞাতবাসকালের প্রাতঃমুহূর্তে যুধিষ্ঠির কর্তৃক দুর্গা স্তব ।

অর্জুনকৃত দুর্গাস্তব (২)

নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্যে মন্দরবাসিনী ।
কুমারী কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে ॥ ১
ভদ্রকালি নমস্তুভ্যং মহাকালি নমোঽস্তুতে ।
চণ্ডি চণ্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি ॥ ২
কাত্যায়নি মহাভাগে করালি বিজয়ে জয়ে ।
শিখিপিচ্ছ ধ্বজধরে নানা ভরণ-ভূষিতে ॥ ৩

অষ্টশূল প্রহরণে খড়্গ খেটক ধারিণি ।
গোপেন্দ্রস্যানুজে জ্যেষ্ঠে নন্দগোপকুলোদ্ভবে ॥ ৪
মহিষাসৃক্‌প্রিয়ে নিত্যং কৌশিকি পীতবাসিনি ।
অট্টহাসে কোকমুখে নমোস্তেহস্তু রণপ্রিয়ে ॥ ৫
উমে শাকম্ভরি শ্বেতে কৃষ্ণে কৈটভ নাশিনি ।
হিরণ্যাক্ষি বিরূপাক্ষি সুধূম্রাক্ষি নমোহস্তুতে ॥ ৬
বেদশ্রুতি মহাপুণ্যে ব্রহ্মণ্যে জাতবেদসি ।
জম্বুকটক - চৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে ॥ ৭
ত্বং ব্রহ্ম বিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্ ।
স্কন্দ মাতর্ভগবতী দুর্গে কান্তারবাসিনি ॥ ৮
স্বাহাকারঃ সুধাচৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী ।
সাবিত্রী বেদমাতা চতথা বেদান্ত উচ্যতে ॥ ৯
স্তুতাহসি ত্বং মহাদেবী বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা ।
জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বং প্রসাদাৎ রণাজিরে ॥ ১০
কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানাং চালয়েষু চ ।
নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্ ॥ ১১
ত্বং জৃম্ভনী মোহিনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীস্তথৈব চ ।
সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা ॥ ১২
তুষ্টিঃ পুষ্টির্ধৃতিদীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্য বিবর্ধিনী ।
ভূতির্ভূতিমতাং সংখ্যেবীক্ষসে সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ১৩
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে গীতা প্রকরণে ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণস্তুতি

১। স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ১১।৩৬

২। কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে ।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ১১।৩৭

৩। ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ—
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ১১।৩৮

৪। বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ১১।৩৯

৫। নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব ।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ১১।৪০

৬। সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ১১।৪১

৭। যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ১১।৪২

৮। পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।
ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম প্রভাব ॥ ১১।৪৩

৯। তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ ।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয় প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ১১।৪৪

১০। অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ১১।৪৫

১১। কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত—
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ১১।৪৬

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা- একাদশোঽধ্যায় :—
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি- অর্জ্জুনের স্তুতি ।

দেবীস্তুতি ।

ঋষিরুবাচ । ১

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা ।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা ।
বাগ্ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ ॥ ২

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তি সমূহমূর্ত্যা ।
তামম্বিকামখিলদেব মহর্ষি পূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥ ৩

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাসুরভয়স্য মতিং করোতু ॥ ৪

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনা কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥ ৫

কিং বর্ণয়াম্ তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি ।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্বেষু দেবাসুরদেবগণাদিকেষু ॥ ৬

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ—
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা ।
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত—
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥ ৭

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি ।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু—
রুচ্চার্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥ ৮

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ—
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ ৯

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান—
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্ ।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী ॥ ১০

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা ।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥ ১১

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র—
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্ ।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাত্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥ ১২

দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটীকরাল—
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ ।
প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥ ১৩

দেবী প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি ।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত—
—ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥ ১৪

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥ ১৫

ধর্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্মাণ্য—
ত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি ।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতী প্রসাদা—
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন ॥ ১৬

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি ।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥ ১৭

এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্ ।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥ ১৮

দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্ ।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতাঃ
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী ॥ ১৯

খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্ ।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড—
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥ ২০

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ ।
বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥ ২১

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র ।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা ।
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥ ২২

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্ধনি তেঽপি হত্বা ।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে ॥ ২৩

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে ।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ ॥ ২৪

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাশ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে ।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য চোত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥ ২৫
সৌম্যানি যানি রূপানি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে ।
যানি চাত্যন্তঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্ ॥ ২৬
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রানি তেঽম্বিকে ।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ ॥ ২৭

শ্রীশ্রীচণ্ডী - শক্রাদিকৃত - দেবী স্তুতি চতুর্থ অধ্যায়ঃ ।

শিব - প্রদোষ - স্তোত্রাষ্টকম্

সত্যং ব্রবীমি পরলোকহিতং ব্রবীমি
সারং ব্রবীম্যুপনিষদ্ধৃদয়ং ব্রবীমি ।
সংসারমূলণসারমবাপ্য জন্তোঃ
সারোঽয়মীশ্বরপদাম্বুরুহস্য সেবা ॥ ১ ॥

যে নার্চ্চয়ন্তি গিরিশং সময়ে প্রদোষে
যে নার্চ্চিতং শিবমপি প্রণমন্তি চান্যে ।
যে তৎকথাং শ্রুতিপুটৈর্ন পিবন্তি মূঢ়া—
স্তে জন্মজন্মসু ভবন্তি নরা দরিদ্রাঃ ॥ ২ ॥

যে বৈ প্রদোষসময়ে পরমেশ্বরস্য
কুর্বন্ত্যনন্যমনসোঽঙ্ঘ্রি সরোজপূজাম্ ।
নিত্যং প্রবৃদ্ধধনধান্যকলত্রপুত্র—
সৌভাগ্যসম্পদধিকাস্ত ইহৈব লোকে ॥ ৩ ॥

কৈলাসশৈলভুবনে ত্রিজগজ্জনিত্রীং
গৌরীং নিবেশ্য কনকাচিতরত্নপীঠে ।
নৃত্যং বিধাতুমভিবাঞ্ছতি শূলপাণৌ
দেবাঃ প্রদোষ সময়ে নু ভজন্তি সর্বে ॥ ৪ ॥

বাগ্‌দেবী ধৃতবল্লকী শতমুখো বেণুং দধৎ পদ্মজ –
স্তালোন্নিদ্রকরো রমা ভগবতী গেয়প্রয়োগান্বিতা ॥
বিষ্ণু সান্দ্রমৃদঙ্গবাদনপটুর্দেবা সমন্তাৎ স্থিতাঃ
সেবন্তে তমনু প্রদোষসময়ে দেবং মৃড়ানীপতিম্ ॥ ৫ ॥

গন্ধর্বযক্ষপতগোরগসিদ্ধসাধ্য
বিদ্যাধরামরবরাপ্সরসাং গণাশ্চ ।
যেঽন্যে ত্রিলোকনিলয়াঃ সহভূতবর্গাঃ
প্রান্তে প্রদোষসময়ে হরপার্শ্বসংস্থাঃ ॥ ৬ ॥

অতঃ প্রদোষে শিব এক এব
পূজ্যোঽথ নান্যে দিতি জারয়ন্তে ।
তস্মিন্মহেশে বিধিনেজ্যমানে
সর্বে প্রসীদন্তি সুরাধিনাথাঃ ॥ ৭ ॥

এষ তে তনয়ঃ পূর্বজন্মনি ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।
প্রতিগ্রহৈর্বৃথা নিন্যে ন দানাদ্যৈঃ সুকর্মভিঃ ॥
অতোদারিদ্র্যমাপন্নঃ পুত্রস্তে দ্বিজভামিনি
তদ্দোষপরিহারার্থং শরণং যাতু শঙ্করম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দ পুরাণে শিবপ্রদোষ - স্তোত্রাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

চৌত্রিশস্তব ।

ক কন্যাকল্পলতা কেলীঃ কল্যাণীকল্পবাসিনী ॥
কলিকল্মষসংহর্ত্রীকালকাননবাসিনী ॥ ২০।১৩৪

কালসেব্যা কালময়ীকালিকা কামকোত্তমা ।
কামদা কারণাখ্যা চ কামিনী কীর্তিধারিণী ॥ ২০।১৩৫

কোকামুখী কোরকাক্ষী কুরঙ্গনয়নী করিঃ ।
কজ্জলাক্ষী কান্তিরূপা কামাখ্যা কেশরিস্থিতা ॥ ২০।১৩৬

খ খগা খলপ্রাণহরা খলদূরকরা খলা ।
খেলন্তী খরবেগা চ খকারবর্ণবাসিনী ॥ ২০।১৩৭

গ গঙ্গা গগনরূপা চ গগনাধ্বপ্রসারিণী ।
গরিষ্ঠা গণনীয়া চ গোপালী গোগণস্থিতা ॥ ২০।১৩৮

গোপৃষ্ঠাবাসিনী গম্যা গভীরা গুরুপুষ্করা ।
গোবিন্দা গোস্বরূপা চ গোনাম্নী গতিদায়িনী ॥ ২০।১৩৯

ঘ ঘূর্ণমানা ঘর্ম্মহরা ঘূর্ণৎস্রোতা ঘনোপমা
ঘূর্ণাখ্যদোষহরণী ঘূর্ণয়ন্তী জগত্রয়ম্ ॥ ২০।১৪০

ঘোরা ঘৃতোপমজলা ঘর্ঘরারঘোষিণী ।
ঘোরাঙ্ঘ্রাঘাতিনী ঘুষ্যা ঘোষা ঘোরাঘহারিণী ॥ ২০।১৪১

ঘোষরাজা ঘোষকন্যা ঘোষনীয়া ঘনালয়া ।
ঘন্টাটঙ্কারঘটিতা ঘাঙ্কারী ঘঙ্ঘচারিণী ॥ ২০।১৪২

ঙ ঙান্তা ঙকারিণা ঙেশী ঙকারবর্ণসংশ্রয়া ।

চ চকোরনয়নী চারুমুখী চামরধারিণী ॥ ২০।১৪৩

চন্দ্রিকা শুক্লসলিলা চন্দ্রমণ্ডলবাসিনী ।
চৌকারবাসিনী চর্চ্চ্যা চমরী চর্ম্মবাসিনী ॥ ২০।১৪৪

চর্ম্মহস্তা চন্দ্রমুখী চূচুকদ্বয়শোভিনী ।

ছ ছত্রিলা ছত্রিতাঘাবিশ্ছত্রচামরশোভিতা ॥ ২০।১৪৫

ছত্রিতা ছদ্মসংহন্ত্রী দুরিত ব্রহ্মারূপিণী ।

ছায়া চ স্থল শূন্যা চ ছলয়ন্তী ছলান্বিতা ॥ ২০।১৪৬

ছিন্নমস্তা চ্ছলধরাচ্ছবর্ণা চ্ছুরিতাচ্ছবি : ।

জীমূতবাসিনী জিহ্বা জবাকুসুমসুন্দরী ॥ ২০।১৪৭

জ জরাশূরজরাজ্বালা জবিনী জবনেশ্বরী ।

জোতীরূপাজন্মহরা জনার্দ্দনমনোহরা ॥ ২০।১৪৮

ঝ ঝঙকারকারিণী ঝঝ্বা ঝর্ঝরী বাদ্যরূপিণী ।

ঝননূপুরসংশব্দা ঝরাব্রহ্মঝরাঝরা ॥ ২০।১৪৯

ঞ ঞকারেশী ঞকারস্থা ঞবর্ণমধ্যনামিকা ।

ট টঙকারকারিণী টঙকধারিণী টঙকটুঙকনা ॥ ২০।১৫০

ঠ ঠক্কুরাণী ঠদ্বয়েশী ঠঙকারী ঠক্কুরপ্রিয়া ।

ড ডামরী ডমরাধীশা ডামরেশীশিরঃস্থিতা ॥ ২০।১৫১

ডমরুধ্বনিনৃত্যন্তী ডাকিনীডয়হারিণী ।

ডীনা ডয়িনী ডিন্ডী চ ডিন্ডাধ্বনিসদাপ্রিয়া ॥ ২০।১৫২

ঢ ঢক্কারবা চ ঢক্কারী ঢক্কাবাদনভূষণা ।

ণ ণকারবর্ণধরণী ণকারীযানভাবিনী ॥ ২০।১৫৩

ত তৃতীয়া তীব্রপাপঘ্নী তীব্রা তরুণীমণ্ডলা ।

তুষারকরতুল্যাস্যা তুষারকরবাসিনী ॥ ২০।১৫৪

থ থকারাক্ষী থবর্ণস্থা দন্দশূকবিভূষণা ।

দ দূরদৃষ্টির্দুরগমা দুষ্টগন্ত্রী দুবদুবা ॥ ২০।১৫৫

ধন দীর্ঘচক্ষুর্দীর্ঘরবা ধনরূপা ধনেশ্বরী ।
নীরজাক্ষা নীররূপা নিষ্কলা নিরহংক্রিয়া ॥ ২০।১৫৬

প পরাপরা পরাপেক্ষা পারায়ণপরায়ণা ।
পারকর্ত্রী পণ্ডিতা চ পণ্ডাপণ্ডিতসেবিতা ॥ ২০।১৫৭

পরা পবিত্রা পুণ্যখ্যা পালিকা পীতবাসিনী ।
ফ ফুৎকারদূরদুরিতা ফাণয়ন্তী ফণাশ্রয়া ॥ ২০।১৫৮

ফেনিলা ফেনদশনা ফেনাফেনবতী ফণা ।
ফেৎকারিণী ফণিধরা ফণিলোকনিবাসিনী ॥ ২০।১৫৯

ফাল্টাকৃতালয়া ফুল্লা ফুল্লারবিন্দলোচনা ।
ব বেণীধরা বলবতী বেগবাদিধরাবহা ॥ ২০।১৬০

বন্দারুবন্দ্যা বৃন্দেশী বনবাসা বনাশ্রয়া ।
ভ ভীমরাজী ভীমপত্নী ভবশীর্ষকৃতালয়া ॥ ২০।১৬১

ভাস্করা ভাস্করধরা ভূষা ভাস্করবাদিনী ।
ভয়ঙ্করী ভয়ঙ্করা ভূষণা ভূমিভেদিনী ॥ ২০।১৬২

ভগভাগ্যবতী ভব্যা ভবদুঃখনিবারিণী ।
ভেরুণ্ডা ভেরুসুগমা ভদ্রকালী ভবস্থিতা ॥ ২০।১৬৩

ম মনোরমা মনোজ্ঞা চ মৃতামোক্ষমহামতিঃ ।
মতিদাত্রী মতিহরা মঠস্থা মোক্ষরূপিণী ॥ ২০।১৬৪

য যমপূজ্যা যজ্ঞরূপা যজমানী যমসুসা ।
যমদণ্ডস্বরূপা চ যমদণ্ডহরা যতিঃ ॥ ২০।১৬৫

র রক্ষিকা রাত্রিরূপা চ রমণীয়া রমা রতিঃ ।
ল লবঙ্গলেশরূপা চ লেশনীয়া লয়প্রদা ॥ ২০।১৬৬

ব বিবৃদ্ধা বৃষহস্তা চ বিশিষ্টা বেশধারিণী ।
শ শ্যামরূপা শরৎকন্যা শারদী শরণশ্রুতা ॥ ২০।১৬৭

শ্রুতিগম্যা শ্রুতিস্তুত্যা শ্রীমুখী শরণপ্রদা ।
ষ ষষ্ঠীষট্‌কোণনিলয়া ষট্‌কর্ম্মপরিষেবিতা ॥ ২০।১৬৮

স সাত্ত্বিকী সত্যবসতিঃ সানন্দা সুখরূপিণী ।
হ হরিকন্যা হরিসুতা হরিদুর্গা হরীশ্বরী ।
ক্ষ ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমরূপা ক্ষুরধারাম্বুশোষিণী ॥ ২০।১৬৯

অনন্ত ইন্দিরা ঈশা উমা উষা ঋষর্ণিকা ।
ঋষারূপা ৯কারস্থা ৯৯কারী এসিতা তথা ॥ ২০।১৭০

ঐশ্বর্যদায়িনী ওককারিণী ঔমকারিণী ।
অঙকশূন্যা অঙকধরা অঃস্পর্শা অন্ধধারিণী ॥ ২০।১৭১

সর্ব্ববর্ণময়ী বর্ণব্রহ্মরূপাখিলাত্মিকা ।
প্রসন্না শুক্লদশনা পরমার্থা পুরাতনী ॥ ২০।১৭২

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণম্ - মধ্যখন্ডম্ - বিংশোঽধ্যায় ।

হিমালয় কৃত - শিবস্তোত্রম্ ।

হিমালয় উবাচ –

ত্বং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা চ ত্বং বিষ্ণু পরিপালকঃ ।
ত্বং শিবঃ শিবদোঽনন্তঃ সর্ব্বসংহারকারকঃ ॥ ১
ত্বমীশ্বরোগুণাতীতো জ্যোতিরূপঃ সনাতনঃ ।
প্রকৃতিঃ প্রকৃতীশশ্চ প্রাকৃত প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ২

নানারূপবিধাতা ত্বং ভক্তানাং ধ্যানহেতবে ।
যেষু রূপেষু যৎ প্রীতিস্তত্তদ্রূপং বিভর্ষি চ॥ ৩
সূর্যস্ত্বং সৃষ্টিজনক আধার সর্বতেজসাম্ ।
সোমস্ত্বং শস্যপাতা চ সততং শীতরশ্মিনা ॥ ৪
বায়ুস্ত্বং বরুণস্ত্বঞ্চ বিদ্যাংশ্চ বিদুষাং গুরুঃ ।
মৃত্যুঞ্জয়ো মৃত্যুমৃত্যুঃ কালকালো যমান্তকঃ ॥ ৫
বেদস্ত্বং বেদকর্তা চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।
মন্ত্রস্ত্বং হি জপস্ত্বং হি তপস্ত্বং তৎফলপ্রদঃ ॥ ৬
বাক্ ত্বং বাগধিদেবস্ত্বং তৎকর্তা তদ্গুরুঃ স্বয়ম্ ।
অহো সরস্বতীবীজ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ ৭
ইত্যেবমুক্ত্বা শৈলেন্দ্রস্তস্থৌ ধৃত্বা পদাম্বুজম্ ।
তত্রোবাস তমাবোধ্য চাবরুহ্য বৃষাচ্ছিবঃ ॥ ৮
স্তোত্রমেতন্মহাপুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং য পঠেন্নরঃ ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো ভয়েভ্যশ্চ ভবার্ণবে ॥ ৯
অপুত্রো লভতে পুত্রং মাসমেকং পঠেদ্যদি ।
ভার্য্যাহীনো লভেদ্ভার্য্যাং সুশীলাং সুমনোহরাম্ ॥ ১০
চিরকালগতং বস্তু লভতে সহসা ধ্রুবম্ ।
রাজ্যভ্রষ্টো লভেদ্রাজ্যং শঙ্করস্য প্রসাদতঃ ॥ ১১
কারাগারে শ্মশানে চ শত্রুগ্রস্তেঽতিসঙ্কটে ।
গভীরেঽতিজলোকীর্ণে ভগ্নপোতে বিষাদনে ॥ ১২
রণমধ্যে মহাঘোরে হিংস্রজন্তুসমন্বিতে ।
সর্বতো মুচ্যতে স্তুত্বা শঙ্করস্য প্রসাদতঃ ॥ ১৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে হিমালয়কৃতং
শ্রীশিবস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্তুতি ।

১॥ কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥ ১০।১

২॥ ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহস্যাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১০।২

৩॥ ত্বং মহান প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজ সত্ত্বতমোময়ী ।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥ ১০।৩

৪॥ গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ।
কোন্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্সিদ্ধং গুণসংবৃতঃ ॥ ১০।৪

৫॥ তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে ।
আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্ন-মহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১০।৫

৬॥ যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ১০।৬

৭॥ স ভগবান্ সর্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ ।
অবতীর্ণোঽংশভাগেন সাম্প্রতং পরিরাশিষাম্ ॥ ১০।৭

৮॥ নমঃ পরমকল্যাণঃ ! নমঃ পরমমঙ্গল !
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ১০।৮

৯॥ অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচরকিঙ্করৌ ।
দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ ॥ ১০।৯

১০॥ বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ ।

স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে ।
দৃষ্টিঃ সতাং দরশনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥ ১০।১০

শ্রীমদ্ভাগবতম্— দশম অধ্যায়-

দামোদর শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জুন-ভঞ্জনলীলা-রহস্য ও কৃষ্ণপাদপদ্ম-স্পর্শ-হেতু শাপাবসানে যমলার্জুন-বৃক্ষ হ'তে নির্গত কুবেরাত্মজদ্বয়ের দিব্যদেহধারণপূর্বক কৃষ্ণ স্তুতি ।

বাসুদেব - স্তুতি

শ্রীদেবক্যুবাচ—

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং,
ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্বিকারম্ ।
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং,
সত্ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥ ১

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু ।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতেঽশেষসংজ্ঞঃ ॥ ২

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো ।
চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্ ।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তং
ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥ ৩

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন,
লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ ।
তৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য,
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ ৪

সত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্ন ,
স্ত্রাহি ত্রস্তান ভৃত্য বিশ্বাসহাসি ।
রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং
মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ ॥ ৫

জন্মতে ময়াসৌ পাপো মাবিদ্যাস্মধুসূদন ।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ ॥ ৬

উপসংহর বিশ্বাত্মন্ আদো রূপমলৌকিকম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্ ॥ ৭

শ্রীমদ্ভাগবত্ – ৩য় অধ্যায়

কংসকারাগারে কংসভয়ে ভীত মাতা-দেবকী কর্তৃক পুত্র কৃষ্ণকে ভগবদ্জ্ঞানে স্তুতি ।

বিষ্ণোঃ শতনামস্তোত্রম্ ।

ওঁ বাসুদেবং হৃষীকেশং বামনং জলশায়িনম্ ।
জনার্দ্দনং হরিং কৃষ্ণং শ্রীপতিং গরুড়ধ্বজম্ ॥ ১

বারাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং নরকান্তকম্ ।
অব্যক্তং শাশ্বতং বিষ্ণমনন্তমজব্যয়ম্ ॥ ২

নারায়ণং গদাধ্যক্ষং গোবিন্দং কীর্ত্তিভাজনম্ ।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরং দেবং ভূধরং ভুবনেশ্বরম্ ॥ ৩

বেত্তারং যজ্ঞপুরুষং যজ্ঞেশং যজ্ঞবাহকম্ ।
চক্রপাণিং গদাপাণিং শঙ্খপাণিং নরোত্তমম্ ॥ ৪

বৈকুণ্ঠং দুষ্টদমনং ভৃগুর্ভং পীতবাসসম্ ।
ত্রিবিক্রমং ত্রিকালজ্ঞং ত্রিমূর্তিং নন্দনন্দনম্ ॥ ৫

রামং রামং হয়গ্রীবং ভীমং রৌদ্রং ভবোদ্ভবম্ ।
শ্রীনাথং শ্রীধরং শ্রীশং মঙ্গলং মঙ্গলায়ুধম্ ॥ ৬

দামোদরং দমোপেতং কেশবং কেশিসূদনম্ ।
বরেণ্যং বরদং বিষ্ণুং মানদং বসুদেবজম্ ॥ ৭

হিরণ্যরেতসং দীপ্তং পুরাণং পুরুষোত্তমম্ ।
সকলং নিষ্কলং শুদ্ধং নির্গুণং গুণশাশ্বতম্ ॥ ৮

হিরণ্যতনুসঙ্কাশং সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্ ।
মেঘশ্যামং চতুর্বাহুং কুশলং কমলেক্ষণম্ ॥ ৯

জ্যোতীরূপমরূপঞ্চ স্বরূপং রূপসংস্থিতম্ ।
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বরূপস্থং সর্ব্বেশং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ১০

জ্ঞানং কূটস্থমচলং জ্ঞানদং পরমং প্রভুম্ ।
যোগীশং যোগনিষ্ণাতং যোগিনং যোগরূপিণম্ ॥ ১১

ঈশ্বরং সর্ব্বভূতেশং বন্দে ভূতময়ং বিভুম্ ।
ইতি নামশতং দিব্যং বৈষ্ণবং খলু পাপহম্ ॥ ১২

ব্যাসেন কথিতং পূর্ব্বং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স ভবেৎ বৈষ্ণবো নরঃ ॥
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩

— ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীবিষ্ণুশতনামস্তোত্রম্ —
ইদং সম্পূর্ণম্ ।

কালীশতনামস্তোত্রম্ —

শ্রীদেব্যুবাচ ।

নমস্তে পার্ব্বতীনাথ বিশ্বনাথ দয়াময় ।
জ্ঞানাৎ পরতরং নাস্তি শ্রুতং বিশ্বেশ্বর প্রভো ॥ ১
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো বিশ্বেশ্বর জগৎপতে ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি গোপ্যং পরমকারণম্ ।
রহস্যং কালিকায়াশ্চ তারায়াশ্চ সুরোত্তম ॥ ২

শ্রীশিব উবাচ ।

রহস্যং কিং বদিষ্যামি পঞ্চবক্ত্রৈর্মহেশ্বরি ।
জিহ্বাকোটিসহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটিশতৈরপি ॥ ৩
বক্তুং ন শক্যতে তস্য মাহাত্ম্যং বৈ কথঞ্চন্ ।
তস্যা রহস্যং গোপ্যং কিং ন জানাসি শঙ্করি ॥ ৪
সুসৈব চরিতং বক্তুং সমর্থা স্বয়মেব হি ।
অন্যথা নৈব দেবেশি জায়তে তৎ কথঞ্চন্ ॥ ৫
কালিকায়াঃ শতং নাম নানা তন্ত্রে ত্বয়া শ্রুতম্ ।
রহস্যং গোপনীয়ঞ্চ তন্ত্রেঽস্মিন্ জগদম্বিকে ॥ ৬
করালবদনা কালী কামিনী কমলা কলা ।
ক্রিয়াবতী কোটরাক্ষী কামাক্ষা কামসুন্দরী ॥ ৭
কপালা চ করালা চ কালী কাত্যায়নী কুহূঃ ।
কঙ্কালা কালবদনা করুণা কমলার্চ্চিতা ॥ ৮
কাদম্বরী কালহরা কৌতুকী কারণপ্রিয়া ।
কৃষ্ণা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণপূজিতা কৃষ্ণবল্লভা ॥ ৯
কৃষ্ণা পরাজিতা কৃষ্ণপ্রিয়া চ কৃষ্ণরূপিণী ।
কালিকা কালরাত্রিশ্চ কুলজা কুলপণ্ডিতা ॥ ১০

কুলকর্ম্মাপ্রিয়া কামা কাম্যকর্ম্মবিভূষিতা ।
কুলপ্রিয়া কুলরতা কুলীনপরিপূজিতা ॥ ১১
কুলজা কমলাপূজ্যা কৈলাস - নগ -ভূষিতা ।
কুটজা কেশিনী কাম্যা কামদা কামপণ্ডিতা ॥ ১২
করালাস্যা চ কন্দর্পকামিনী রূপশোভিতা ।
কোলমুকা কোলরতা কেশিনী কেশভূষিতা ॥ ১৩
কেশবস্য প্রিয়া কাশা কাশ্মীরা কেশবার্চ্চিতা ।
কামেশ্বরী কামরূপা কামদানবিভূষিতা ॥ ১৪
কালহন্ত্রী কূর্ম্মমাংসপ্রিয়া কূর্ম্মাদিপূজিতা ।
কেলিনী করকাকারা করকর্ম্মনিষেবিণী ॥ ১৫
কটকেশ্বরমধ্যস্থা কটকী কটকার্চ্চিতা ।
কটপ্রিয়া কটরতা কটকর্ম্মনিষেবিণী । ১৬
কুমারীপূজনরতা কুমারীগণসেবিতা ।
কুলাচারপ্রিয়া কৌলপ্রিয়া কৌলনিষেবিণী ॥ ১৭
কুলীনা কুলধর্ম্মজ্ঞা কুলভীতিবিমর্দ্দিনী ।
কালধর্ম্মপ্রিয়া কাম্য - নিত্যা কামস্বরূপিণী ॥ ১৮
কামরূপা কামহরা কামমন্দিরপূজিতা ।
কামাগারস্বরূপা চ কালাখ্যা কালভূষিতা ॥ ১৯
ক্রিয়াভক্তিরতা কাম্যানাম্বৈব কামদায়িনী ।
কোলপুষ্পামুরা কোলা নিকোলা কলহপ্রিয়া ॥ ২০
কৌষিকী কেতকী কুন্তী কুন্তলাদিবিভূষিতা ॥ ২১
ইত্যেবং শৃণু চার্ব্বাঙ্গি রহস্যং সর্ব্বমঙ্গলম্ ।
যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২
শতনামপ্রসাদেন কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ২৩
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাসবাদ্যা দিবৌকসঃ ।
রহস্যপঠনাদ্দেবি সর্ব্বেচ বিগতজ্বরাঃ ॥ ২৪

ত্রিষু লোকেষু বিশ্বেশি সত্যং গোপ্যমতঃ পরম্ ।
নাস্তি নাস্তি মহামায়ে তন্ত্রমধ্যে কথঞ্চন ॥ ২৫
সত্যং বচ্মি মহেশানি নাতঃপরতরং প্রিয়ে ।
ন গোলকে ন বৈকুণ্ঠে ন চ কৈলাসমন্দিরে ॥ ২৬
রাত্রাবপি দিবাভাগে যদি দেবি সুরেশ্বরি ।
প্রজপেদ্ ভক্তিভাবেন রহস্যস্তবমুত্তমম্ ॥ ২৭
শতনামপ্রসাদেন মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ২৮
কুজবারে চতুর্দ্দশ্যাং নিশাভাগে জপেত্তু যঃ ।
সকৃতী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞঃ সকুলীনঃ সদা শুচিঃ ॥ ২৯
সকুলজ্ঞঃ স কালজ্ঞঃ স ধর্ম্মজ্ঞো মহীতলে ॥ ৩০
রহস্য পঠনাৎ কোটিপুরশ্চরণজং ফলম্ ।
প্রাপ্নোতি দেবদেবেশি সত্যং পরমসুন্দরি ॥ ৩১
স্তবপাঠাদ্ বরারোহে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিশ্চ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩২
রাত্রৌবিশ্বতলেঽশ্বত্থমূলেঽপরাজিতা তলে ।
প্রপঠেৎ কালিকাতন্ত্রং যথাশক্ত্যা মহেশ্বরি ॥ ৩৩
শতবার - প্রপঠনান্মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৩৪
নানাতন্ত্রং শ্রুতং দেবি মম বক্ত্রাৎ সুরেশ্বরি ।
মুণ্ডমালা মহামন্ত্রং মহামন্ত্রস্য সাধনম্ ॥ ৩৫
ভক্ত্যা ভগবতীং দুর্গাং দুঃখদারিদ্র্যনাশিনীম্ ।
সংস্মরেদ্ যো জপেদধ্যায়েৎ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৬
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়স্তন্ত্রভক্তি পরায়ণঃ ।
স সাধকো মহাজ্ঞানী যশ্চ দুর্গাপদানুগঃ ॥ ৩৭
ন চ ভক্তির্ন বাহ্যভক্তির্ন মুক্তির্নগনন্দিনি ।
বিনা দুর্গাং জগদ্ধাত্রি নিষ্ফলং জীবনং ভবেৎ ॥ ৩৮

শক্তিমার্গরতো ভূত্বা যোঽন্যমার্গে প্রধাবতি ।
ন চ শক্তিস্তস্য বক্ত্রং পরিপশ্যতি শঙ্করি ॥ ৩৯
বিনা তন্ত্রাদ্ বিনা মন্ত্রাদ বিনা যন্ত্রান্মহেশ্বরি ।
ন চ ভক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ জায়তে বরবর্ণিনি ॥ ৪০
যথা গুরুর্মহেশানি যথা চ পরমো গুরু : ।
তন্ত্রবক্তা গুরু : সাক্ষাদ্ যথা চ জ্ঞানদ : শিব : ॥ ৪১
তন্ত্রং তন্ত্রবক্তারং নিন্দন্তি তান্ত্রিকীং ক্রিয়াম্ ।
যে জনা ভৈরবস্তেষাং মাংসাস্থিচর্ব্বণোদ্যতা : ॥ ৪২
অতএব চ তন্ত্রজ্ঞং ন নিন্দতি কদাচন ।
ন হসন্তি ন হিংসন্তি ন বদন্ত্যন্যথা বুধা : ॥ ৪৩
ইতি শ্রীমুণ্ডমালাতন্ত্রেঽষ্টমপটলে কালীশতনামস্তোত্রং
সম্পূর্ণম্ ।

—XXXX —

গুরুস্তোত্রম্ —

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বর : ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নম : ॥ ১
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নম : ॥ ২
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নম : ॥ ৩
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যেন কৃৎস্নং চরাচরম্ ।
তদ্পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নম : ॥ ৪
চিদ্রূপেণ পরিব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নম : ॥ ৫

সর্বশ্রুতিশিরোরত্ন সমুদ্ভাসিতমূর্তয়ে ।
বেদান্তাম্বুজ - সূর্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৬

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং ।
বিন্দুনাদকলাতীত তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৭

জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়তত্ত্বমালাবিভূষিতঃ ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৮

অনেকজন্মসম্প্রাপ্ত - কর্মেন্ধনবিদাহিনে ।
আত্মজ্ঞানাগ্নিদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৯

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ প্রাপণং সারসম্পদঃ ।
যস্য পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১০

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১১

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ ।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১২

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্ ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১৩

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্ ।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ ১৪

(বিশ্বসারতন্ত্র- নির্বাচিত)

—xxx—

শ্রীদুর্গাস্তবরাজ :

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে ।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ১

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে ।
নমস্তে সদানন্দনন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ২

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ,
ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তো : ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারকর্ত্রী ,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৩

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে —
হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু -
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৪

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে,
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্ ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা ,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৫

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দণ্ডলীলা —
সমুৎখণ্ডিতা খণ্ডলাশেষভীতে ।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্ন সন্দোহহন্ত্রী,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৬

ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি —

নমেয়াজিতাহক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা ।

ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী,

নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৭

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে ,

সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে ।

বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং ,

নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৮

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং ,

মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং ।

নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিরাবৃতানাং ,

ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥ ৯

ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকম্ ।

ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ ॥ ১০

মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে ।

সকৃত্শ্লোকমেকং বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদা ॥ ১১

স সর্বদুষ্কৃতিং তীর্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ।

পঠনাদস্য দেবেশি কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ১২

(বিশ্বসার, আপদুদ্ধারকল্প)

—XXXX —

শিবষড়ক্ষর - স্তোত্রম্ —

ওঁকারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ।
কামদং মোক্ষদঞ্চৈব "ওঁ" - কারায় নমো নমঃ ॥ ১
নমন্তি ঋষয়ো দেবা নমন্ত্যপ্সরসাং গণাঃ ।
নরা নমন্তি দেবেশং "ন" - কারায় নমো নমঃ ॥ ২
মহদেবং মহাত্মানং মহাধ্যানং পরায়ণম্ ।
মহাপাপহরং দেবং "ম" — কারায় নমো নমঃ ॥ ৩
শিব শান্তঃ জগন্নাথং লোকানুগ্রহকারকম্ ।
শিবমেকপদং নিত্যং "শি" - কারায় নমো নমঃ ॥ ৪
বাহনং বৃষভো যস্য বাসুকিঃ কণ্ঠভূষণম্ ।
বামে শক্তিধরং দেবং "ব" - কারায় নমো নমঃ ॥ ৫
যত্র যত্র স্থিতো দেবঃ সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বরঃ ।
যো গুরুঃ সর্ব্বদেবানাং "য়" — কারায় নমো নমঃ ॥ ৬
ষড়ক্ষরমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৭
ইতি - শ্রীরুদ্রযামলে উমামহেশ্বর - সংবাদে শিবষড়ক্ষরস্তোত্রং
সম্পূর্ণম্ ।

—XXX —

ব্রহ্মস্তোত্রম্

ওঁ নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায় ।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ১
ত্বমেকং শরণং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্ ।

ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিষ্কলং নির্বিকল্পম্ ॥ ২
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্ ।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্ ॥ ৩
পরেশ প্রভো সর্বরূপাবিনাশি –
ন্বনির্দ্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য ।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥ ৪
তদেকং স্মরামস্তদেকং ভজাম –
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরেণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৫
পরব্রহ্মমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা ব্রহ্ম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬

(মহানির্বান তন্ত্র –)

গঙ্গাস্তোত্রম্

দেবী সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে ।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥ ১
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতঃ - স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥ ২
হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে ।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্ ॥ ৩

তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্ ।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে ।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে, পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৫

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্তাং ন পততি লোকে ।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে, বিবুধবধূকৃততরলাপাঙ্গে ॥ ৬

তব কৃপয়া চেৎ স্যাতঃ স্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥ ৭

পরিলসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে ।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥ ৮

রোগং শোকং পাপং তাপং, হর মে ভগবতি কুমতিকলাপং ।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥ ৯

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে ।
তব তটনিকটে যস্য হি বাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥ ১০

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ ।
অথ গবাক্ষো শ্বপচো দীনো, ন পুনর্দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥ ১১

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে ।
গঙ্গাস্তবমিমমমলং নিত্যং পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥ ১২

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ, তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ ।
মধুরমনোহরপঙ্ক্তিকাভিঃ পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥ ১৩

গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং বাঞ্ছিতফলদং বিদিতমুদারং ।
শঙ্করসেবকরচিতং, পঠতু চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্ ॥ ১৪

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য - বিরচিত,
নির্বাচিত ।

—xxxx —

শিবপঞ্চাক্ষর - স্তোত্রম্ —

১॥ নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায়
ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায় ।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়
তস্মৈ "ন"- কারায় নমঃ শিবায় ॥

২॥ মন্দাকিনীসলিল - চন্দন - চর্চ্চিতায়
নন্দীশ্বর - প্রমথনাথমহেশ্বরায় ।
মন্দারপুষ্প - বহুপুষ্প - সুপূজিতায়
তস্মৈ "ম" - কারায় নমঃ শিবায় ॥

৩॥ শিবায় গৌরীবদনাব্জবৃন্দ —
সূর্য্যায় দক্ষাধ্বরনাশকায় ।
শ্রী নীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায়
তস্মৈ "শি" — কারায় নমঃ শিবায় ॥

৪॥ বশিষ্ট - কুম্ভোদ্ভবগৌতমার্য্য —
মুনীন্দ্র - দেবার্চ্চিত - শেখরায় ।
চন্দ্রার্ক - বৈশ্বানর - লোচনায়
তস্মৈ "ব" — কারায় নমঃ শিবায় ।

৫॥ যজ্ঞস্বরূপায় জটাধরায়
পিনাকহস্তায় সনাতনায় ।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায়
তস্মৈ "য়" - কারায় নমঃ শিবায় ॥

৬॥ পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ
বা শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য -বিরচিতং শিব -পঞ্চাক্ষর - স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

—xxx —

দশাবতার স্তোত্রম্

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং,
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্ ।
কেশব ধৃতমীনশরীর, - জয় জগদীশ হরে ॥ ১

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে ,
ধরণিধরণ কিণচক্রগরিষ্ঠে ।
কেশব ধৃতকচ্ছপরূপ, — জয় জগদীশ হরে ॥ ২

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না ,
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।
কেশব ধৃতশূকররূপ, — জয় জগদীশ হরে ॥ ৩

তবকরকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং ,
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃত নরহরিরূপ, — জয় জগদীশ হরে ॥ ৪

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন,
পদনখনীরজনিতজনপাবন ।
কেশব ধৃতবামনরূপ, — জয় জগদীশ হরে ॥ ৫

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং, —
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্ ।
কেশবধৃত ভৃগুপতিরূপ, — জয় জগদীশ হরে ॥ ৬
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমণীয়ং ,
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্
কেশব ধৃতরঘুপতিরূপ, — জয়জগদীশ হরে ॥ ৭

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং,
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্ ।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং ,
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্ ।
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর, - জয়জগদীশ হরে ॥ ৯

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং ,
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর, - জয় জগদীশ হরে ॥ ১০

শ্রী জয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং ,
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ।
কেশবধৃত দশবিধরূপ, - জয় জগদীশ হরে ॥ ১১

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে ।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ ১২

শ্রীমৎ জয়দেব গোস্বামীকৃত
দশাবতার স্তোত্র ।

গীতগোবিন্দ ।

—xxx—

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রম্

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো ।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ১

অপালমিত্রবামকুন্তলভরং মন্দোন্নতভ্রূলতং
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কোমলাধর পুটং সাচিপ্রসারেক্ষণম্ ।

আলোলাঙ্গুলিপল্লবৈর্মুরলিকামাপূরয়ন্তং মুদা
মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং জানে জগন্মোহনম্ ॥ ২
হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে ।
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব ।
হে রামানুজ হে জগত্ত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥ ৩
কস্তুরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্ ।
সর্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্ কণ্ঠে চ মুক্তাবলিং
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ ॥ ৪
লোকানুন্মদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ শ্রোণীরুহান্ হর্ষয়ন্
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিশময়ন্ গোবৃন্দমানন্দয়ন্ ।
গোপান্ সম্ভ্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরানজৃম্ভয়ন্
ওঙ্কারার্থমুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ ॥ ৫
সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্ ।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ॥ ৬

- বিল্বমঙ্গল -

—XXXX —

শ্রীজগন্নাথ স্তোত্রম্

কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীতকরবো
মুদাভীরীনারীবদনকমলাস্বাদমধুপঃ ।
রমাশম্ভুব্রহ্মাসুরপতিগণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে মহচরকটাক্ষং বিলসয়ন্ ।
সদা শ্রী মদ্বৃন্দাবনবসতি লীলাপরিচয়ো
জগন্নাথ : স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২
মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজবলভদ্রেণ বলিনা ।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথ : স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩
কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমলপঙ্কেরুহমুখঃ ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো
জগন্নাথ : স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪
রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেব পটলৈঃ
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া
জগন্নাথ : স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫
পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহতচরণোঽনন্তশিরসি ।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখো
জগন্নাথ : স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬
ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্ ।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথ : স্বামী নয়নপথগামী ভবত মে ॥ ৭

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপারাং যাদবপতে।
অহো দীননাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং
জগন্নাথ : স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮
জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং য : পঠেৎ প্রযত : শুচি : ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯

— শ্রীচৈতন্য ।

—xxx —

॥ সমাপ্তম্ ॥

বৈদিক শান্তিবচন - সূক্তাদি

১। ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা ,
মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ ,
আবিরাবীর্ম এধি, বেদস্য ম আণীস্থ: ,
শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সন্দধামি,
ঋতং বদিষ্যামি, সত্য বদিষ্যামি, তন্মামবতু ,
তদ্বক্তারমবতু, অবতু মাম্ অবতু বক্তারম্ ,
অবতু বক্তারম্ ॥ ওঁ শান্তি : শান্তি : শান্তি : ॥

ঋগ্বেদীয়শান্তিবচন ।

—০ —

২। ওঁ পূর্ণমদ : পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তি : শান্তি : শান্তি: ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ – ৫।১। ১

শুক্লযজুর্বেদীয় শান্তিবচনম্

—০ —

৩। ওঁ শং নো মিত্র : শং বরুণ : । শং নো ভবত্বর্যমা ।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতি: । শং নো বিষ্ণুরুরুক্রম : ।
নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো । ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ।
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি । ঋতং বদিষ্যামি ।
সত্যং বদিষ্যামি । তন্মামবতু । তদ্বক্তারমবতু ।
অবতু মাম্ । অবতু বক্তারম্ ।
ওঁ শান্তি : শান্তি : শান্তি :

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ১।১

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শান্তিবচনম্

— ০ —

৪। ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহবীর্যং করবাবহৈ ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ – ২।১

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শান্তি বচনম্ ।

—০ —

৫। ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি , বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ
শ্রোত্রমথ বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি ।

সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং । মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং,
মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু,
অনিরাকরণং মেহস্তু । তদাত্মনি নিরতে য
উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু ,
তে ময়ি সন্তু । ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

সামবেদীয়শান্তিবচনম্ ।

—০ —

৬। ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ক
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ খ

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ঋগ্বেদ ১।৮৯

অথর্ববেদীয়শান্তি বচনম্ ।

—০ —

মধুমতী - সূক্তম্

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব : ।
মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধী : ॥ ১
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজ : ।
মধু দ্যৌরস্তু ন : পিতা ॥ ২
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য : ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু ন : ॥ ৩
শং নো মিত্র : শং বরুণ : শং নো ভবত্বর্যমা ।
শনং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতি : শং নো বিষ্ণুরুরুক্রম : ॥ ৪

ঋগ্বেদ ১।৯০। ৬ - ৯ । স্বাধ্যায়- সমাপ্তম্।

বৃহদারণ্যক - ৬।৩।৬

—০—

সপ্তশ্লোকী গীতা স্তোত্রম্

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয় সমনু স্মরেদ য : ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমস : পরস্তাৎ ॥ ৮।৯
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মমা মনুস্মরণ ।
য : প্রযাতি ত্যজন্ দেহং সযাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৮।১৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণ ॥ ৯।৩৪

অর্জ্জুন উবাচ —

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধ সঙ্ঘাঃ ॥ ১১।৩৬

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩।১৩

ঊর্ধ্বমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১৫।১

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতি জ্ঞানমপোহনঞ্চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ । ১৫।১৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবদ্ - গীতাসূপনিষদসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সপ্ত শ্লোকী গীতা সম্পূর্ণা ।

—XX —

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা —

—0 —

চতুঃশ্লোকী ভাগবত স্তোত্রম্ ।

—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতম্ ।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ ।
তথৈব তত্ত্ব বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদযৎসদসৎ পরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥

—— ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টাদশ —
সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে
ভাগবদ্ ব্রহ্মসংবাদে চতুঃশ্লোকী ভাগবদ স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

—XXX — শ্রীমদ্ভাগবদ্ ।

— 0 —

সপ্তশ্লোকী চণ্ডী — স্তোত্রানি ।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ১
দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতি মতীব শুভাং দদাসি ।
দারিদ্র দুঃখ ভয় হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকার করণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥ ২
সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে ।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ৩
শরণাগতদীনার্ত - পরিত্রাণ পরায়ণে ।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ৪
সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে ।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ৫

রোগানশেষান্ অপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্ ।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রলয়ান্তি ॥ ৬
সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরী ।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্ বৈরী বিনাশনম্ ॥ ৭

সপ্ত শ্লোকী চণ্ডী সমাপ্তা ।

—o—

১

শ্রীরামের দুর্গাস্তুতি

১। নমস্তে সর্ব্বাণী ঈশানী ইন্দ্রাণী
ঈশ্বরী ঈশ্বরজায়া ।
অর্পণা অভয়া অন্নপূর্ণা জয়া
মহেশ্বরী মহামায়া ॥

২। উগ্রচণ্ডা উমা আশুতোষ ধূমা
অপরাজিতা উর্ব্বশী ।
রাজরাজেশ্বরী রমা রণকরী
শঙ্করী শিবে ষোড়শী ॥

৩। মাতঙ্গী বগলে কল্যাণী কমলে
ভবানী ভুবনেশ্বরী ।
সর্ব্ব বিশ্বোদরী শুভে শুভঙ্করী
ক্ষিতি ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী ॥

৪। সহস্র সুহস্থা ভীমা ছিন্নমস্তা ।
মাতা মহিষমর্দ্দিনী ।
নিস্তারকারিণী নরকবারিণী
নিশুম্ভ শুম্ভ ঘাতিনী ॥

৫। দৈত্য নিকৃন্তিনি শিবসীমন্তিনী
শৈলসুতা সুবদনী ।
বিরিঞ্চবন্দিনী দুষ্ট নিষ্কন্দিনী
দিগম্বরের ঘরণী ॥

৬। দেবী দিগম্বরী দুর্গে দুর্গ অরি
কালিকে করালবেশী ।
শিবে শবারূঢ়া চণ্ডী চন্দ্রচূড়া
ঘোররূপা এলোকেশী ॥

৭। সর্ব্ব সুশোভিনী ত্রৈলোক্য মোহিনী
নমস্তে লোলরসনা ।
দেবী দিগ্বসনা সর্ব্বা শবাসনা
বিশ্বা বিকটদশনা ॥

৮। সারদা বরদা শুভদা সুখদা
অন্নদা মোক্ষদা শ্যামা ।
মৃগেশবাহিনী মহেশজায়িনী
সুরেশবন্দিনী বামা ॥

৯। কামাখ্যা রুদ্রাণী হরা হররাণী
হররমা কাত্যায়নী ।
শমনত্রাসিনী অরিষ্ট নাশিনী
দয়াময়ী দাক্ষায়নী ॥

১০। হের মা পার্ব্বতি আমি দীন অতি
আপদে পড়েছি বড় ।
সর্ব্বদা চঞ্চল পদ্মপত্রজল
ভয়ে ভীত জড়সড় ॥

১১। বিপদে আমার না হয় তোমার
বিড়ম্বনা করা আর ।
মম প্রতি দয়া কর গো অভয়া
ভবার্ণবে কর পার ॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণ
লংকাকাণ্ড

দেবগণের স্তুতি — শচীমাতা গর্ভস্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু বন্দনা ।

১। "জয় জয় মহাপ্রভু জনক সভারি ।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-হেতু অবতার ॥ ১।২।১৪৭

২। জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম-সাধু-বিপ্রপাল ।
জয় জয় অভক্ত-মদন মহাকাল ॥ ১।২।১৪৮

৩। জয় জয় সর্ব্ব-সত্যময়-কলেবর ।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর ॥ ১।২।১৪৯

৪। যে তুমি অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের বাস ।
সে তুমি শ্রীশচী-গর্ভে করিলা প্রকাশ ॥ ১।২।১৪৯

৫। তোমার যে ইচ্ছা, কে বুঝিতে তার পাত্র ?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তোমার লীলা মাত্র ॥ ১।২।১৫১

৬। সকল সংহার যাঁর ইচ্ছায় সংসারে ।
সে কি কংস-রাবণ বধিতে বাক্যে নারে ? ১।২।১৫২

৭। তথাপিহ দশরথ-বসুদেব-ঘরে ।
অবতীর্ণ হইয়া বধিলা তা' সভারে ॥ ১।২।১৫৩

৮। এতেকে কে বুঝে প্রভু তোমার কারণ ?
আপনি সে জান তুমি আপনার মন ॥ ১।২।১৫৪

৯। তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার ॥ ১।২।১৫৫

১০। তথাপিহ তুমি সে আপনি অবতরি ।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি ॥ ১।২।১৫৬

১১। সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্র-বর্ণ ধরি ।
তপোধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি ॥ ১।২।১৫৭

১২। কৃষ্ণাজিন, দণ্ড, কমণ্ডলু, জটা ধরি।
ধর্ম্ম স্থাপ' ব্রহ্মচারি রূপে অবতরি ॥ ১।২।১৫৮

১৩। ত্রেতা-যুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হই যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধর্ম্ম ॥ ১।২।১৫৯

১৪। স্রুক্-স্রুব-হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সভারে লওয়াও যজ্ঞ, যাজ্ঞিক হইয়া ॥ ১।২।১৬০

১৫। দিব্য-মেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে ॥ ১।২।১৬১

১৬। পীতবাস-শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি।
পূজাকর, মহারাজ-রূপে অবতরি ॥ ১।২।১৬২

১৭। কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদগোপ্য সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম ॥ ১।২।১৬৩

১৮। কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার ? ১।২।১৬৪

১৯। হয়গ্রীব-রূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি-দৈত্য দুই "মধু" "কৈটভ" সংহার ॥ ১।২।১৬৫

২০। মৎস্য-রূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহর।
কূর্ম্ম-রূপে তুমি সব-জীবের আধার ॥ ১।২।১৬৬

২১। শ্রীবরাহ-রূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহ-রূপে কর হিরণ্য-বিদার ॥ ১।২।১৬৭

২২। বলি ছল' অপূর্ব্ব বামন-রূপ হই।
পরশুরাম-রূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী ॥ ১।২।১৬৮

২৩। রামচন্দ্র-রূপে কর রাবণ-সংহার।
হলধর-রূপে কর অনন্ত-বিহার ॥ ১।২।১৬৯

২৪। বুদ্ধ-রূপে দয়া-ধর্ম্ম করহ প্রকাশ ।
কল্কী-রূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ ॥ ১।২।১৭০

২৫। ধন্বন্তরি-রূপে কর অমৃত প্রদান ।
হংস-রূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান ॥ ১।২।১৭১

২৬। শ্রীনারদ-রূপে বীণা ধরি কর গান ।
ব্যাস-রূপে কর নিজ-তত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥ ১।২।১৭২

২৭। সর্ব্বলীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি সঙ্গে ।
কৃষ্ণ-রূপে গোকুলে করিলা বহু-রঙ্গে ॥ ১।২।১৭৩

২৮। এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি ।
কীর্ত্তন করিবা সর্ব্বশক্তি পরচারি ॥ ১।২।১৭৪

২৯। সঙ্কীর্ত্তনে পূর্ণ হৈব সকল-সংসার ।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তি-পরচার ॥ ১।২।১৭৫

৩০। কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ-প্রকাশ ।
তুমি নৃত্য করিবে মিলিয়া সর্ব্ব-দাস ॥ ১।২।১৭৬

৩১। যে তোমার পাদপদ্মে ধ্যান নিত্য করে ।
তা' সভার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে ॥ ১।২।১৭৭

৩২। পদতালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল ।
দৃষ্টিমাত্রে দশদিগ হয় সুনির্ম্মল ॥ ১।২।১৭৮

৩৩। বাহু তুমি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন নাশ ।
হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস ॥ ১।২।১৭৯

৩৪। সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া ।
করিবা কীর্ত্তন-প্রেম ভক্ত-গোষ্ঠী লৈয়া ॥ ১।২।১৮০

৩৫। এ মহিমা প্রভু বলিবারে কার শক্তি ।
তুমি বিলাইবা বেদগোপ্য বিষ্ণুভক্তি ॥ ১।২।১৮১

৩৬। মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি ।
আমি সব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি ॥ ১।২।১৮২

৩৭। জগতেরে প্রভু তুমি দিবা' হেন ধন ।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ ॥ ১।২।১৮৩

৩৮। যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্ব-যজ্ঞ পূর্ণ ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ ॥ ১।২।১৮৪

৩৯। এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয় ।
যেন আমা' সভার দেখিতে ভাগ্য হয় ॥ ১।২।১৮৫

৪০। এতদিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ ।
তুমি ক্রীড়া করিবে দেবীর অভিমত ॥ ১।২।১৮৬

৪১। যে তোমারে যোগেশ্বর-সভে দেখে ধ্যানে ।
সে তুমি বিদিত হৈবা নবদ্বীপ-গ্রামে ॥ ১।২।১৮৭

৪২। নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার ।
শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার ॥ " ১।২।১৮৮

(শ্রীচৈতন্যভাগবত — আদিখণ্ড — ২য় অধ্যায় । দেবগণের স্তুতি)

জগাই মাধাইর — গৌর-নিতাই স্তুতি

১। "জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর ।
জয় জয় নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর-ধর ॥ ১।১৩।২৪৮

২। জয় জয় নিজনাম- বিনোদ আচার্য্য ।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্ব-কার্য্য ॥ ১।১৩।২৪৯

৩। জয় জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন ।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-শরণ ॥ ১।১৩।২৫০

৪। জয় জয় শচীপুত্র করুণার সিন্ধু ।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু ॥ ১।১৩।২৫১

৫। জয় জয় পণ্ডিতদুহিতা -প্রাণেশ্বর ।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময়-কলেবর ॥ ১।১৩।২৫২

৬। সেই জয়প্রভু — তুমি যত কর কাজ ।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ ॥ ১।১৩।২৫৩

৭। জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর ।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূতবর ॥ ১।১৩।২৫৪

৮। জয় জয় মৈত্রীজীবন গৌরচন্দ্র ।
জয় জয় সহস্রবদন নিত্যানন্দ ॥ ১।১৩।২৫৫

৯। জয় গদাধর-প্রাণ মুরারি-ঈশ্বর ।
জয় হরিদাস- বাসুদেব-প্রিয়কর ॥ ১।১৩।২৫৬

১০। পাপী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে ।
"পরম অদ্ভুত" যাহা ঘোষয়ে সংসারে ॥ ১।১৩।২৫৭

১১। আমি দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার ।
অদ্ভুত পাইল পূর্ব্ব-মহিমা তোমার ॥ ১।১৩।২৫৮

১২। অজামিল-উদ্ধারের যতেক মহত্ত্ব ।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব ॥ ১।১৩।২৫৯

১৩। সত্য কহি, আমি কিছু স্তুতি নাহি করি ।
উচিতেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী ॥ ১।১৩।২৬০

১৪। কোটি-ব্রহ্ম বধি যদি তোর নাম লয়ে ।
"সদ্য মোক্ষ তার" বেদে এই সত্য কহে ॥ ১।১৩।২৬১

১৫। হেন নাম অজামিল কৈল উচ্চারণ ।
তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন ॥ ১।১৩।২৬২

১৬। বেদ-সত্য পালিতে তোমার অবতার ।
মিথ্যা হয় বেদ তবে না কৈলে উদ্ধার ॥ ১।১৩।২৬৩

১৭। আমি দ্রোহ কৈলুঁ প্রিয়-শরীরে তোমার ।
তথাপিহ আমি দুই করিলে উদ্ধার ॥ ১।১৩।২৬৪

১৮। এবে বুঝি দেখ প্রভু ! আপনার মনে ।
কত কোটি অন্তর আমরা দুইজনে ॥ ১।১৩।২৬৫

১৯। "নারায়ণ" নাম শুনি অজামিল-মুখে ।
চারি মহাজন আইলা সেই জন জন দেখে ॥ ১।১৩।২৬৬

২০। আমি দেখিলাঙ তোমা" রক্ত-পাড়ি অঙ্গে ।
সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র, পারিষদ — সব সঙ্গে ॥ ১।১৩।২৬৭

২১। গোপ্য করি রাখিছিলা এ সব মহিমা ।
এবে ব্যক্ত হৈল প্রভু ! মহিমার সীমা ॥ ১।১৩।২৬৮

২২। এবে সে হইল বেদ মহাবলবন্ত ।
এবে সে বড়াঞি করি পাইব অনন্ত ॥ ১।১৩।২৬৯

২৩। এবে সে বিদিত হৈল গোপ্য-গুণগ্রাম ।
"নির্লজ্জ-উদ্ধার" প্রভু ! ইহার নাম ॥ ১।১৩।২৭০

২৪। যদি হেন বোল কংস-আদি দৈত্যগণ ।
তাহারাও দ্রোহ করি পাইল মোচন ॥ ১।১৩।২৭১

২৫। কত লক্ষ্য আছে তথি দেখ নিজ-মনে ।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে ॥ ১।১৩।২৭২

২৬। তোমা' সনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে ।
ভয়ে তোমা'' নিরন্তর চিন্তিলেক মর্ম্মে ॥ ১।১৩।২৭৩

২৭। তথাপি নারিল দ্রোহ-পাপ এড়াইতে ।
পড়িল নরেন্দ্র-সব বংশের সহিতে ॥ ১।১৩।২৭৪

২৮। তোমারে দেখিতে নিজ শরীর ছাড়িল ।
তবে কোন্ মহাজনে তারে পরশিল ? ১।১৩।২৭৫

২৯। তোমারে পরশে' এবে ভাগবতগণে ।
ছায়া ছত্রি যেই জন কৈলা গঙ্গাস্নানে ॥ ১।১৩।২৭৬

৩০। সর্ব্বমতে প্রভু ! তোর এ মহিমা বড় ।
কাহারে ভাণ্ডিবে ? — সভে জানিলেক দঢ় ॥ ১।১৩।২৭৭

৩১। মহাভক্ত গজরাজ করিলা স্তবন ।
একান্তশরণ দেখি করিলা মোচন ॥ ১।১৩।২৭৮

৩২। দৈবে সে উপমা নহে অসুরা পূতনা ।
অঘ-বক-আদি যত, কেহো নহে সীমা ॥ ১।১৩।২৭৯

৩৩। ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্য-গতি ।
বেদ বিনে তাহা দেখে কাহার শকতি ॥ ১।১৩।২৮০

৩৪। যে করিলা এই দুই পাতকী-শরীরে ।
সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল-সংসারে ॥ ১।১৩।২৮১

৩৫। যতেক করিলা তুমি পাতকী উদ্ধার ।
কারো কোনোরূপে লক্ষ্য আছে সভাকার ॥ ১।১৩।২৮২

৩৬। নির্লক্ষ্যে তারিলা বৃহদ্দৈত্য দুইজন ।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ ॥" ১।১৩।২৮৩

(শ্রীচৈতন্যভাগবত – মধ্যখন্ড – ১৩শ অধ্যায় – জগাই-মাধাই কর্তৃক
গৌর-নিতাই স্তব)

কালকেতু কর্তৃক দেবীর চৌত্রিশাস্তব ।

ক. কহিছে কালীকে কালকেতু রক্ষা তরে ।
কৈলাস ছাড়িয়া মাগো উর কারাগারে ।। ১

কালী কপালিনী মাতা কপোলকুন্তলা ।
কালরাত্রি কজ্জমুখী কত জান কলা ।। ২

কলিকালে কালুর কলুষ কর নাশ ।
কলিঙ্গে কপট করি রাখ নিজ দাস ।।
তব ধনহেতু কালী তব ধন হেতু ।
কঠিন কলিঙ্গ রায় বধে কালকেতু ।।

খ. খরতর রাজা মাতা যেন ক্ষুরধার ।
খন্ড খন্ড কলেবর করিল আমার ।।
এ খেদ খন্ডন করি খলে কর নাশ ।
খন্ডিয়া সকল দোষ রাখ নিজ দাস ।।

গ. গিরিজা গণেশমাতা গতি সবাকার ।
গোকুল রাখিলা গোপকুলে অবতার ।।
গহন-নিগড়ে মাতা দগধে শরীর ।
গলিত করহ মাতা গলার জিঞ্জির ।।

ঘ. ঘোররূপা ঘোরতপা ঘোষণ-ভীষণা ।
ঘন ঘন কৈলা রণে ঘন্টার বাজনা ।।
ঘন শ্যাম বহে মুখে গায়ে কালঘাম ।
ঘরের সেবক মাতা স্মারে তব নাম ।।
উচ্চ নীচ সমান করিতে জান তুমি ।
উমা মহেশ্বরী মাগো বেরুণীয়া আমি ।।
উদ্ধার করহ মাতা রাজ-কারাগারে ।
উচিত বলিতে মাগো নাহিক আমারে ।।

চ. চঞ্চল-চেতন আমি চল্লিশ বন্ধনে ।
চোরের চরিত্র হৈল চন্ডিকার ধনে ॥
চণ্ডী চণ্ডবতী মাতা চণ্ড কর দূর ।
চরণ-সরোজে স্থান দেহ মা কালুর ॥

ছ. ছল ধরি রাজা গো ধনের ছলে বান্ধে ।
ছলে ধন দিয়া বধ বিনা অপরাধে ॥
ছেদন করিবে রাজা তব ধন-ছলে ।
ছায়া দিয়া রাখ তব চরণ-কমলে ॥

২

জ. জগত-জননী জয়া জগত-বন্দিনী ।
জন্ম-জরা-মৃত্যুহরা জয়ন্তী জননী ॥
জটাজুটবতী জয়া শশি-শিরোমণি ।
জীবের জীবন জনার্দ্দন-সহায়িনী ॥

ঝ. ঝোপ ঝাপে বধিতাম যত পশুগণ ।
ঝগড়াবিহীন ছিল ব্যাধের নন্দন ॥
ঝনঝনা-সম মাতা হৈল তব ধন ।
ঝটিতি করহ মাতা ঝগড়া মোচন ॥

ট. টানাটানি করে চুলে ধরিয়া কোটাল ।
টঙ্গি টাঙ্গি হানে কেহ কেহ করবাল ॥
টিটকারি করে পাইক নামে পরাজয়ী ।
টঙ্কারিয়া দুঃখ দূর কর কৃপাময়ী ॥

ঠ. ঠাকুরাণী হয়ে দাসে দিলে গো শরণ ।
ঠাকুরালি দিয়া মাতা বধ কি কারণ ॥
ঠন ঠন করিয়া রাজার ঠাট বিন্ধে ।
ঠাঁই দেহ ঠাকুরাণী চরণারবিন্দে ॥

ড. ডাহিনে ডাকিনী মাতা ডমরুরূপিণী ।
ডমরু মধ্যম মাতা ডিণ্ডিমবাদিনী ॥
ডাকা নাহি দেই ডাকাতের নহি সাথী ।
ডরে প্রাণ ঢোল হৈল রক্ষ ভগবতী ॥

ঢ. ঢক্ক ঢক্কাতি নহি আখেটীর জাতি ।
ঢোল ঢক্কা নাহি করি পরের যুবতী ॥
ঢেকা মারি লয় প্রাণ শত শত জন ।
ঢালিনু তোমার পায়ে আপন জীবন ॥

ত. ত্রিগুণা ত্রিবীজা তারা ত্রিলোক-তারিণী ।
ত্রিপুরা করহ ত্রাণ ত্রিপুর-নাশিনী ॥
ত্বরিত তারহ তারা তাপিত তনয় ।
ত্রাণ হেতু তুমি মাতা আর কেহ নয় ॥

৩

থ. থর থর করে প্রাণ পাথর চাপনে ।
থুইলা কলঙ্ক মাতা এ তিন ভুবনে ॥
থাকিয়া রাজার আগে বন্ধ কর দূরে ।
স্থিত কর আরবার গুজরাট পুরে ॥

দ. দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দক্ষের দুহিতা ।
দনুজ-দলনী দয়াবতী দেবমাতা ॥
দুর্জ্জয়া দক্ষিণা কালী দূরিত-নাশিনী ।
দুঃখী দাসে কর দয়া দুঃখ-বিমোচনী ॥
দূর কর দুঃখ মোর অকাল মরণ ।
দুর্জ্জয় সাগরে দুর্গা করহ রক্ষণ ॥

ধ. ধীমণা ধারণাবতী ধেয়ান-ধারিণী ।
ধরিত্রী ধরণী ধরাধরের নন্দিনী ॥
ধরিয়া ধনের দায় ধরাপতি বান্ধে ।
ধন দিয়া বধ কর বিনা অপরাধে ॥

ন. নিশুম্ভনাশিনী জয়া নীলপতাকিনী ।
নির্গুণানির্ভয়া মাতা কুণ্ডল-বাসিনী ॥
নমঃ নমঃ নারায়ণী নগেন্দ্রনন্দিনী ।
নৃপতি নিবাসে ভয় ভাঙ্গহ ভবানি ॥
নন্দ-গোপ-সুতা হয়ে রাখিলা গোকুলে ।
নৃপতি-নিবাসে আসি হও অনুকূল ॥

প. পশুপতি প্রজাপতি পুরুষ পুরাণ ।
পদ্মযোনি-প্রিয়া দেবী পার্ব্বতী আখ্যান ॥
প্রজাপতি প্রতিদিন পূজা করে তোমা ।
পশু সম শিশু আমি কি জানি মহিমা ॥
প্রণত-বৎসলা তুমি পরম মঙ্গল ।
পাদপদ্মে দেহ স্থান সেবক-বৎসলা ॥

ফ. ফারক করিয়া দেহ ব্যাধের নন্দনে ।
ফল বেচি ফল খাই কিবা ফল ধনে ॥
ফণি-ফণা-মণি দিয়া ফের দিলে মোরে ।
ফাঁফর হইয়া পাছে সে ফুল্লরা মরে ॥

ব. বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিহরা সংসার-বন্দিনী ।
বন্ধ পূর কর মোর বন্ধন-হারিণী ॥

ভ. ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভৈরবী ভারতী ।
ভয়ঙ্কর স্থানে রক্ষা কর ভগবতী ॥
ভদ্রকালী ভূপালিনী ভ্রমর-ভূষণী ।
ভূপতি-ভবনে ভয় ভাঙ্গহ ভবানি ॥

ম. মৃগাঙ্ক-মুকুট-মণি মস্তক-মালিনী ।
মহিষমর্দ্দিনী মধু-কৈটভ-নাশিনী ॥
মহেশ-মোহিনী মন্দ-মরাল-গমনা ।
মহামায়া মহেশ্বরী মহেন্দ্র-মানিনী ॥

মহামেঘসমা মেরু - মন্দার - মন্দিরা ।
মহামায়া মহাদেবী মাধবী ইন্দিরা ॥

য. যদু - ঘোষা যুগন্ধরা যজ্ঞ - বিনাশিনী ।
যশোদা - নন্দিনী জয়া যমুনা যামিনী ॥
যমের যাতনা হৈতে বড়ই যাতনা ।
যশ গাই যদি মম পুরাও বাসনা ॥

র. রঙ্গ হয়ে রয়েছিনু রঙ্গবধে রত ।
রত্ন দিয়া রঙ্গরস করাইলা হত ॥
রাজাসনে রণ কৈনু রক্ষা নাহি আর ।
রঙ্গিণী করহ রক্ষা তবে সে উদ্ধার ॥

ল. লুট গেল ধন লণ্ডভণ্ড হৈল গারী ।
লক্ষ্য নাহি দিলা যথা রহে মোর নারী ॥
লোভমতি আমি অতি লম্পট পাতকী ।
লোভে লক্ষ ধন লয়ে লাভ কৈনু কি ॥

ব. বিশালাক্ষী বিশ্বময়ী বিশ্বনির্ম্মায়িণী ।
বাসুদেব - বামদেব - বিধি - সহায়িনী ॥
বিপদে করিলে বসুদেবের উদ্ধার ।
বশ হৈলে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার ॥

শ. শঙ্খিনী শূলিনী শিবা শর্ব্বাণী শঙ্করী ।
শক্তি-রূপা শিখরবাসিনী শাকম্ভরী ॥
শিখরিনন্দিনী শান্তি শশিশিরোমণি ।
শরণদা শক্তি-রূপা শম্ভু - বিলাসিনী ॥

ষ. ষড়ানন - মাতা শিবা ষড়ঙ্গ - রূপিণী ।
ষড়রিপু নিবারিয়া রাখ গো ভবানি ॥

স. সতী সাধ্বী সনাতনী সংসার-তারিণী ।
সারদা সাবিত্রী সর্ব্বসঙ্কটহারিণী ॥
সর্ব্বলোকে গায় তোমা সেবক বৎসলা ।
সেবকে তারিতে উর শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা ॥

হ. হরিহর হিরণ্যগর্ভের তুমি মল ।
হরিলা নন্দের ভয় রাখিলা গোকুল ॥
হর-জায়া হৈমবতী হেমন্ত-নন্দিনী ।
হও অনুকূলা মাতা হরের গৃহিণী ॥

ক্ষ. ক্ষিতির হরিয়া ভার দৈত্য কৈলা ক্ষীণ ।
ক্ষণেক উরিয়া রাখ দাস আমি দীন ॥
ক্ষমা কর ভগবতী ক্ষয় কর অরি ।
ক্ষমহ সকল দোষ রক্ষ ক্ষেমঙ্করী ॥

(শ্রীকবি কঙ্কণ চণ্ডী – কালকেতু কর্তৃক চৌত্রিশাস্তব)

মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি — চৌত্রিশাস্তব

অ - অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা ।
অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা ॥ ১ ॥

আ - আদ্যা আত্মরূপা আশা পূরাহ আসিয়া ।
আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া ॥ ২ ॥

ই - ইচ্ছারূপা ইন্দুমুখী ইন্দ্রাণী ইন্দিরা ।
ইন্দীবরনয়নী ইঙ্গিতে ইচ্ছ ইরা ॥ ৩ ॥

ঈ - ঈশ্বরী ঈপতিজায়া ঈষদহাসিনী ।
ঈদৃশী তাদৃশী নহ ঈশানইঙ্গিনী ॥ ৪ ॥

উ - উমা উর উরস্থল উপরে উন্মিতা ।
উপকারে উর গো উরগউপবীতা ॥ ৫ ॥

ঊ - ঊর্ধ্বজটা ঊরুরম্ভা ঊষপ্রকাশিকা ।
ঊর্ম্মিতে ফেলিয়া কৈলা ঊষরমৃত্তিকা ॥ ৬ ॥

ঋ - ঋতুরূপা তুমি ঋষিঋতুফের বৃদ্ধি ।
ঋণিচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি ॥ ৭ ॥

ৠ - ৠকার স্বর্গের নাম তুমি ৠরূপিণী ।
ৠস্বরূপা রাখ মোরে ৠবাসদায়িনী ॥ ৮ ॥

ঌ - ঌকার বেদের নাম তুমি সে ঌকার ।
ঌ পড়িলে কি হবে ঌ কি জানে তোমার ॥ ৯ ॥

ৡ - ৡকার দৈত্যের মাতা ৡভব দানব ।
ৡকার স্বরূপা তব বধিলা ৡভব ॥ ১০ ॥

এ - এণবিপুবাহিনী এ একান্তেরে চাও ।
একা আমি এখানে এখন কি এড়াও ॥ ১১ ॥

ঐ - ঐশানী ঐহিক সুখে ঐকান্ত বাসনা ।
ঐরাবতপতি করে ঐ পদ কামনা ॥ ১২ ॥

ও - ওড়পুষ্পওঘ জিনি ওষ্ঠের ওজস ।
ওজোগুণ তরাবার ওপদ ওকস ॥ ১৩ ॥

ঔ - ঔৎপাতিকে ঔপসর্গে তুমি সে ঔষধ ।
ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্ব্বদাহে বধ ॥ ১৪ ॥

অং - অংস্বরূপা অংশুময়ী অংশে কংস অরি ।
অংহেতে অঙ্কিত অঙ্গ রাখ অঙ্কে করি ॥ ১৫ ॥

অঃ অঃকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে ।
অঃ কি কর অঃস্বরূপা রাখ মোরে তোষে ॥ ১৬ ॥

ক - কালী কালকালকান্তা করালী কালিকা ।
কাতরে করুণা কর কুণপকর্ণিকা ॥ ১৭ ॥

খ - খর খড়্গ খর্পর খেটকে খলনাশা ।
খণ্ড খণ্ড কর খলে খলখলহাসা ॥ ১৮ ॥

গ - গিরিজা গিরিশী গৌরী গণেশজননী ।
গয়াগঙ্গা গীতা গাথা গজারিগমনী ॥ ১৯ ॥

ঘ - ঘন ঘন ঘোর ঘটা ঘর্ঘরঘোষিণী ।
ঘনঘন ঘুনুঘুনু ঘাঘর ঘন্টিণী ॥ ২০ ॥

ঙ - ঙ্কার ভৈরব আর বিষড় ঙকার ।
ঙকারস্বরূপা রাখ ঙপদ আমার ॥ ২১ ॥

চ - চন্দ্রচূড়া চণ্ডঘণ্টা চমকচূম্বিকা ।
চাতুরীতে চোর কৈল চাহ গো চণ্ডিকা ॥ ২২ ॥

ছ - ছায়ারূপা ছাবালেরে ছাড় ছদ্ম ছল ।
ছলে লোক ছি ছি বলে আঁখি ছল ছল ॥ ২৩ ॥

জ - জয় জয় জয়াবতী জলদবরণী ।
জয় দেহ জয়ন্তী গো জগতজননী ॥ ২৪ ॥

ঝ - ঝঞ্ঝারূপা ঝড়রূপে ঝাঁপ গো ঝটিত ।
ঝর ঝর মুণ্ড মালে ঝর্ঝর শোণিত ॥ ২৫ ॥

ঞ - ঞকার ঘর্ঘরধ্বনি গায়ন ঞকার ।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার ॥ ২৬ ॥

ট - টঙ্কিনী টমক টাঙ্গী টানিয়া টঙ্কার ।
টিকি ধরি টানে গো টুটাহ টিটিকার ॥ ২৭ ॥

ঠ - ঠাকুরাণী ঠেকাইল এ কি ঠকঠকে ।
ঠেঠায় করিল ঠেঠা ঠক কৈল ঠকে ॥ ২৮ ॥

ড - ডাকিনী ডমরুডম্পে ডাকিয়া ডাগর ।
ডামরবিদিত ডঙ্কা দূর কর ডর ॥ ২৯ ॥

ঢ - ঢঙ্গনাশা ঢাক ঢোল ঢেমসা বাদিনী ।
ঢেসা দিয়া ঢেকা মারে ঢাক গো ঢঙ্কিনী ॥ ৩০ ॥

ণ - ণত্ব ণয়ে জ্ঞান ণত্ব ণকারে নির্ণয় ।
ণস্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয় ॥ ৩১ ॥

ত - ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী ।
তাপিত তনয় তব তারহ তারিণী ॥ ৩২ ॥

থ - থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে ।
থির কর থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে ॥ ৩৩ ॥

দ - দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানবদমনী ।
দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতিদলনী ॥ ৩৪ ॥

ধ - ধরিত্রী ধাতার ধাত্রী ধূর্জ্জটির ধন ।
ধনধান্য ধরা তার ধ্যানের ধারণ ॥ ৩৫ ॥

ন - নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী ।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী ॥ ৩৬ ॥

প - পরমেশী পার কর পড়িয়াছি পাপে ।
পতিত পবিত্র পদ প্রসন্নপ্রতাপে ॥ ৩৭ ॥

ফ - ফলরূপা ফলফুলপ্রিয়া ফণিপ্রিয়া ।
ফাঁফর করিলা ফেরে ফাঁদেতে ফেলিয়া ॥ ৩৮ ॥

ব - বিশালাক্ষী বিশ্বনাথবনিতা বিশেষে ।
বিদ্যা দিয়া বিড়ম্বিয়া বধিলা বিদেশে ॥ ৩৯ ॥

ভ - ভীমা ভীমপ্রিয়া ভীমভীষণভামিণী ।
ভয় ভাঙ্গ ভবানি গো ভবের ভাবিনী ॥ ৪০ ॥

ম - মহামায়া মাহেশ্বরী মহেশ মহিনা ।
মোহিয়া মদনমদে মিছা মজাইলা ॥ ৪১ ॥

য - যশোদা যমুনা যজ্ঞরূপা যদুসুতা ।
যমালয় যাই প্রায় এম যববুতা ॥ ৪২ ॥

র - রক্তবীজরক্তরসে রসিতরসনা ।
রাখ গো রঙ্গিণি রণে রৌরবরটনা ॥ ৪৩ ॥

ল - লহ লহ লক লক লোলে লোলজিহ্বী ।
লটপট লম্বিত ললিতলটলিহি ॥ ৪৪ ॥

ব - বারাহী বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী বালা বালা বলা ।
বন্ধ হৈনু বর্ত্মমানে বাঁচাও বিমলা ॥ ৪৫ ॥

শ - শক্তি শিবা শাকম্ভরী শশিশিরোমণি ।
শুভ কর শুভঙ্করী শমনশমনী ॥ ৪৬ ॥

ষ - ষড়াননমাতা ষড়রাগবিহারিণী ।
ষট্‌পদবরণী ষড়ঋতুবিলাসিনী ॥ ৪৭ ॥

স - সারদা সকলসারা সর্ব্বত্র সঞ্চার ।
সকলে সমান সদা সতের সুসার ॥ ৪৮ ॥

হ - হৈমবতী হেরম্বজননী হরপ্রিয়া ।
হায় হায় হত হই রাখ গো হেরিয়া ॥ ৪৯ ॥

ক্ষ - ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া ।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া ॥

সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে ।
ভারত কহিছে কালী জানিলা অন্তরে ॥

— ভারতচন্দ্র

(অন্নদামঙ্গল — মশানে সুন্দরের কালী স্তুতি । চৌত্রিশাস্তব)

শাক্ত সঙ্গীত

মা বসন পর ।

বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি ।

চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥

কালীঘাটে কালী তুমি, মা গো কৈলাসে ভবানী ।

বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥

পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী ।

কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো ॥

কার বাড়ী গিয়েছিলে, মাগো কে করেছে সেবা ।

শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্ত জবা গো ॥

ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো বাম হস্তে অসি ।

কাটিয়া অসুরের মুন্ড, করেছ রাশি রাশি গো ॥

অসিতে রুধির ধারা, মাগো গলে মুন্ড-মালা ।

হেঁট মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো ॥

মাথায় সোনার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে ।

মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো ॥

আপনি পাগল, পতি পাগল,

মাগো আরও পাগল আছে ।

ওমা, রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল,

চরণ পাবার আশে গো ॥

— রামপ্রসাদ সেন

শাক্ত সঙ্গীত

সদানন্দময়ি কালি ।
মহাকালের মনমোহিনী, গো মা
তুমি আপন্ সুখে আপনি নাচ,
আপনি দেও মা করতালি ॥
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপ শশী ভালী,
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল গো মা'
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ।
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি,
তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি,
যেমন বলাও তেমনি বলি ॥
অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি'
এবার সর্ব্বনাশি, ধ'রে অসি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম - দুটই খেলি ॥

— কমলাকান্ত

ব্রহ্মগীতি

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্বনিকেতন । বিকারবিহীন, কামক্রোধহীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন ।

অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর । সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্বচরাচর ।

অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, একমাত্র নিরাময় । উপমা রহিত, সর্ব্বজন হিত, ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয় ।

সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রহ্ম সুপ্রকাশ । অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা, সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ ।

নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমেন নিয়মে যাঁর । জলবিন্দুপরি, শিল্প কার্য্য করি, দেন রূপ চমৎকার ।

পশু পক্ষি নানা, জন্তু অগণনা, যাঁহার রচনা হয় । স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম, সেই রূপে সব রয় ।

আহার উদরে, দেন সবাকারে, জীবের জীবনদাতা । রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে, পানহেতু বিশ্বপাতা ।

জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় যাঁর নিয়মেতে । সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর, ভাব মনে বিধিমতে ।

— রাজা রামমোহন রায়, রামমোহন গ্রন্থাবলী

একারাদ্য ঈশ্বরস্তুতি ।

অনাদি অনন্ত অজ অজের অক্ষর ।
অক্ষয় অভয় অতি অজয় অমর ॥ ১
অনির্ব্বচনীয় অবয়বে অবতার ।
অখিল অনাথনাথ অতি চমৎকার ॥ ২
অপরূপ অবয়ব নানা অবতারে ।
অদ্ভুত অবস্থা অবলম্ব বারে বারে ॥ ৩
অত্যন্ত অভাব্য ভাব হেরি অবিরত ।
অখিলের অধিপতি অতি অভিমত ॥ ৪
অবিভক্ত অভিযুক্ত অভক্ত প্রভৃতি ।
অবগত আছে তব অদ্ভুত প্রকৃতি ॥ ৫
অত্যন্ত অবোধ আমি অবশ্য অধম ।
অপার মহিমা-সীমা করিতে অক্ষম ॥ ৬
অবনীতে অবনীত করা ভবভাব ।
অধীন হইতে নাহি হয় অনুভাব ॥ ৭
অনাথের নাথ ওহে অধমতারণ ।
অবশ্য অর্ত্তক্য ভাব অনেককারণ ॥ ৮
অবনীলাক্রমে বহ অবনীর ভার ।
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সমৃদ্ধি তোমার ॥ ৯
অপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব অতি মনোহর ।
অতুল্য অমূল্য অর্থ অতি অগোচর ॥ ১০
অনুরূপ অপরূপ অরূপ স্বরূপ ।
অবনতজনে অবগত কত রূপ ॥ ১১

অতীন্দ্রিয় অতিপ্রিয় অনন্তে ভূতলে ।
অন্তরীক্ষে পরিব্যাপ্ত অতল সুতলে ॥ ১২
অবিকার অখণ্ডিত অধিকার তব ।
অণ্ডমাত্র অবলম্বে অবনীসম্ভব ॥ ১৩
অবিজ্ঞেয় অতিধ্যেয় অমর প্রধান ।
অতল - বিতল অধিষ্ঠাতা অসমান ॥ ১৪
অনন্ত সৃষ্টির কর্ত্তা অন্ত কেবা পায় ।
অমরাদি অভিভূত তোমারি মায়ায় ॥ ১৫
অজ্ঞান অকৃতী প্রভু আমি অতি দীন ।
অবেদ্য অভেদ্য ভাব ভাবি অনুদিন ॥ ১৬
অকিঞ্চন হয়ে তব অপ্রমিত গুণে ।
অধিক কি দিব অবস্তব্ধ দেখে শুনে ॥ ১৭
অণু হতে অণু তুমি নাহি অনুরূপ ।
অথচ অখিল-ব্যাপ্ত অতিব্যক্ত রূপ ॥ ১৮
অসাধ্য অবাধ্য মুগ্ধ অবিদ্যার বলে ।
অবোধে অবেদ্য ভাব বর্ণিবে কি বলে ॥ ১৯
অবহিতভাবে তব অভিহিত ভাব ।
অতি অল্প বর্ণিলাম করি অনুভাব ॥ ২০
অধীনের অর্ব্বাচীন অভিপ্রায় যত ।
অনুগ্রহ করি অদ্য হও অবগত ॥ ২১
অবধান অনুমতি হয় এই চাই ।
অন্তে যেন রাঙ্গাপায় অব্যাহতি পাই ॥ ২২

— ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ।

(ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী)

আকারাদ্য ঈশ্বরস্তুতি ।

আদিহীন আদিনাথ আদি সবাকার ।
আশু শিবকারী আত্মা আপনি আমার ॥ ১
আধ্যাত্মিক আদি তাপ আশ্রয় আপদে ।
আশ্চর্য্য আরাম আছে আপনার পদে ॥ ২
আশ্রিত থাকিয়া আশা-নাশা রাঙ্গাপায় ।
আশা নাহি পূরে আর আক্ষেপ বাড়ায় ॥ ৩
আপামর যে রসের পাইয়া আস্বাদ ।
আকুল হইয়া আছে আহা কি আহ্লাদ ॥ ৪
আমা হতে আলোচনা হল না তাহার ।
আক্ষেপ কি ইহা হতে আছে বল আর ॥ ৫
আকার স্বরূপ কিন্তু নাহিক আকার ।
আবার আকারে ব্যাপ্ত আছ সবাকার ॥ ৬
আশ্চর্য্য আকারে আছ অখিল আকারে ।
আদর্শস্বরূপ রূপ আকারে আকারে ॥ ৭
আকার-আকর তুমি আধিপত্য কত ।
অদৃশ্য অথচ আছ আভাসের মত ॥ ৮
আশা পূরে আপনার করিতে আদর ।
আঁখিযুগে আনন্দাশ্রু ঝরে দর দর ॥ ৯
আচ্ছাদিত করে ফেলে আনন আমার ।
আদরের কথা কিছু নাহি সরে আর ॥ ১০
আপনার আদরেতে আপনি আদৃত ।
হও রও আদরের আমোদে আবৃত ॥ ১১
আমারে আদর কর বলিয়া আমার ।
আসন্ন হইল কাল আশঙ্কা অপার ॥ ১২
আপনার আসঙ্গে আসীন হয়ে রই ।
আশা এই আসা যাওয়া হীন যেন হই ॥ ১৩

তুমিই আধেয় বস্তু তুমিই আধার ।
তুমিই আচার্য্য সার তুমিই আচার ॥ ১৪
আপনি আনন্দে আছ আপ্লাবিত হয়ে ।
আত্মহ্য আনন্দে মত্ত যে আনন্দ লয়ে ॥ ১৫
আপনিই অখণ্ডল আদি আচ্ছাদক ।
আপনি আদ্যন্তকারী সাধক বাধক । ১৬
আকীট পতঙ্গ অঙ্গে আকর্ষণ করি ।
আশ্চর্য্য আহ্লাদে আছ আহা মরি মরি ॥ ১৭
তুমি হে আশার ধন আশমাদি কয় ।
দেখো হে আমার আশা যেন সিদ্ধি হয় ॥ ১৮
আশা-নাশ না হলে সে আশা যায় দূরে ।
আশার আশ্রয়ে হয় আসা ঘুরে ঘুরে ॥ ১৯
আশাহীন আরাধনে আশু যে আরাম ।
আশানাশা আশা দেন আমি আত্মারাম ॥ ২০
আশুতোষ আশুতোষ করেন বিধান ।
আশার আজ্ঞার আর থাকে না নিদান ॥ ২১
হে আদ্য আশ্রয় দেহ এই আশা করি ।
আশা-তরী করি ভর যেন আশা তরি ॥ ২২
আপনার প্রতি আমি আস্থা করি যত ।
আশ্চর্য্য আভাস মনে আবির্ভাব তত ॥ ২৩
আচ্ছন্ন হইতে থাকি আপনার রসে ।
আকাঙ্ক্ষা পূরাতে নারি আপনার বশে ॥ ২৪
আদ্য পূর্ব্ব আন্তরিক আছে যে আদ্যাস ।
আত্মাতে আযুক্ত করি আমার আশ্বাস ॥ ২৫
আত্যন্তিক আক্ষেপ আইসে কত মনে ।
আধুনিক আবেদন এই শ্রীচরণে ॥ ২৬

আমরণ আত্মধন আত্মাতে সঁপিয়া ।
আপ্যায়িত থাকি যেন আত্মারে জপিয়া ॥ ২৭
আবৃত্তির আশা আর নাই আত্মনাথ ।
আমার আমার ভাবে কর হে আঘাত ॥ ২৮
আত্মভাবে আছে মম আস্ফালন ভারী ।
আজ তো গেল না "আমি আমার" এ জারী ॥ ২৯
আমি কার কে আমার না পাই আভাষ ।
আনন্দে আটখানা হয়ে ভাবি যে আকাশ ॥ ৩০
আশীর্ব্বাদ কর নাথ আছি যতদিন ।
আপনার আশ্রয়েতে থাকি হে অধীন ॥ ৩১
তব আধিপত্যে চিত্ত নিত্য মত্ত রয় ।
আত্মাসক্তভাবে যেন আয়ুক্ষয় হয় ॥ ৩২

— ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী)

শ্রীরামের দুর্গাস্তব

কঙ্কালি কালবারিণি কালে কৃতার্থকারিণি
কৃশকরা কটাক্ষে কৃতান্ত ।
খরশান খড়্গধরা খলে খণ্ড খণ্ড করা
ক্ষেমঙ্করি ক্ষণে হও মা ক্ষান্ত ॥
গৌরি গজাননমাতা গতিদা গায়ত্রি গীতা
গঙ্গাধর জ্ঞানে গুণ গান তো ।
ঘণ্টানাদ বিলাসিনি ঘটনায় ঘটরূপিণি
ঘনরূপিণি কর মা ঘোরান্ত ॥
উমে ত্বং উমেশরাণি উৎকট পাপ উদ্ধারিণি
উদ্দেশে আছেন উমাকান্ত ।
চিদানন্দ স্বরূপিণি চিত্ত চৈতন্যকারিণি
চণ্ডি চরাচর জন্য চিন্ত ॥
ছলরূপ ছাড়ি ছলে পদছায়া দাও ছাওয়ালে
ছন্দরূপিণি ঘুচাও মা ছন্দ ।
আমার করিবে কি জননি জয়া জয়ন্তি যোগেশ জায়া
জানকী বিচ্ছেদে জীবনান্ত ॥

— দাশরথি রায়

(ড: হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত দাশরথি রায়ের পাঁচালী — রাবণ বধ পালা)

ভক্তি সঙ্গীত

হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি ।
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধামতী ॥
মুক্তি কামনা আমারি হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥
আমার ধরধর জনার্দন, পাপগিরি গোবর্ধন,
কামাদি ছয় কংস চরে, ধ্বংস কর সম্প্রতি ।
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মনধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদিগোষ্ঠে, পুরাও ইষ্ট, এই মিনতি ॥
আমার প্রেমরূপ যমুনা কূলে, আশাবংশীবটমূলে,
সদয় ভাবে, সুদাস ভেবে, সতত কর বসতি ।
যদি বল রাখাল প্রেমে বন্দী আছি ব্রজধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, হবে এই দাশরথি ॥

— দাশরথি রায়

(দাশরথি পাঁচালী — কলঙ্ক ভঞ্জন (২) পালা)

দেশমাতৃকা স্তুতি

"বন্দে মাতরম্ ।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ।
শুভ্র - জ্যোৎস্না - পুলকিত - যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত — দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।

সপ্তকোটীকণ্ঠ - কল - কল - নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে !
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি ;
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল - দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্, অমলাম্, অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্,
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্,
ধরণীং ভরণীম্, মাতরম্ ।

-- ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভক্তি-সঙ্গীত

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে ।
হায় রে, তবে কি মা এমন করে,
তুমি লুকিয়ে থাক্‌তে পারতে ॥
আমি নাম জানি নে, ডাক জানি নে,
আবার জানি নে মা, কোন কথা বল্‌তে ।
তোমায় ডেকে পাই নে তাইতে, —
'আমার জনম গেল কাঁদ্‌তে ॥
দুঃখ পেলে মা তোমার ডাকি'
আবার সুখ পেলে চুপ ক'রে থাকি ডাক্‌তে ।
তুমি মনে ব'সে মন দেখ মা,
আমায় দেখা দেও না তাইতে ॥
ডাকার মত ডাকা শিখাও,
না হয় দয়া ক'রে দেখা দাও আমাকে ।
আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি,
কেবল ভুলে যাই নাম করতে ।
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত,
তোমার ছেলে হ'ত, তবে পারতে জান্‌তে
কাঙ্গাল তোর কোরে কোল কেড়ে নিত,
নাহি স'রতে বল্লে সরতে ॥

— কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ।

বাঙালীর গান

অন্তরতর হে

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে ।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
সুন্দর করো হে ।
জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
নির্ভয় করো হে ।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে ।
অন্তর মম বিকশিত করো'
অন্তরতর হে ।
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত করো হে বন্ধ,
সঞ্চার করো সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ ।
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে,
নন্দিত করো, নন্দিত করো,
নন্দিত করো হে ।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে ।

— গীতাঞ্জলি ৫ সংখ্যক
রবীন্দ্রনাথ দে

শিলাইদহ
২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩১৪

একটি নমস্কারে

একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক
তোমার এ সংসারে।
ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্
তব ভবন-দ্বারে।
নানা সুরের আকুলধারা
মিলিয়ে দিয়ে, আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক
নীরব পারাবারে।
হংস যেমন মানস যাত্রী,
তেমনি সারা দিবসরাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক
মহামরণ-পারে।

— গীতাঞ্জলি ১৪৮ সংখ্যক পদ
২৩শে শ্রাবণ, ১৩১৭

নামের নেশায়

তোমারি নাম বলব নানা ছলে ।
বলব একা বসে, আপন
মনের ছায়াতলে ।
বলব বিনা ভাষায়,
বলব বিনা আশায়,
বলব মুখের হাসি দিয়ে,
বলব চোখের জলে ।

বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পূরবে মনস্কাম ।
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই মুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে ।

— গীতিমাল্য - ৩২ সংখ্যক
রবীন্দ্রনাথ

৮ ভাদ্র ১৩২০

চরণ ধরিতে দিও

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে,
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে ।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে ।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে ।

চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা,
বাঁচাও তাহারে মারিয়া ।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া ।

বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে ।

রামগড়
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

— গীতিমাল্য - ১০৪ সংখ্যক
রবীন্দ্রনাথ

পরশখানি দিও

শুধু তোমার বাণী নয় গো
হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।
সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারা দিনের তৃষা
কেমন করে মেটাব যে
খুঁজে না পাই দিশা।
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়
সেই কথা বলিয়ো।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।
হৃদয় আমার চায় যে দিতে,
কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার
যা কিছু সঞ্চয়।
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো,
দাও গো আমার হাতে,
ধরব তারে, ভরব তারে,
রাখব তারে সাথে —
একলা পথে চলা আমার
করব রমণীয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

— গীতালি - ২৫ সংখ্যক

শান্তিনিকেতন
১৮ ভাদ্র ১৩২১

তুমি অভাগারে চেয়েছ

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ ।
চির- আদরের বিনিময়ে, সখা,
চির অবহেলা পেয়েছ ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দুহাতে পসারি',
ধরে টেনে কোলে নিয়েছ ।
"ওপথে যেওনা, ফিরে এস" ব'লে
কানে কানে কত ক'য়েছ ;
(আমি) তবু চলে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ ।
(এই) চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসি-মুখে তুমি ব'য়েছ ;
(আমার) নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে,
বুকে ক'রে নিয়ে র'য়েছ ।

— রজনীকান্ত সেন

নির্মল কর

তুমি, নির্ম্মল কর, মঙ্গল-করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে ;
তব, পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক্, মোর
মোহ - কালিমা ঘুচায়ে ।
লক্ষ-শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,

জানি না কখন্ ডুবে যাবে কোন্
অকূল - গরল - পাথারে !
প্রভু, বিশ্ববিপদহন্তা,
তুমি, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস, মোর
মত্ত - বাসনা গুছায়ে ।
আছ, অনল - অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধর সলিলে, গহনে,
আছ; বিটপিলতায়, জলদের গায়,
শশিতারকায় তপনে,
আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া,
ব'সে, আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া ;
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝিয়ে ।

— রজনীকান্ত সেন

কে আবার বাঁজায় বাঁশী

কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙ্গা কুঞ্জবনে ।
হৃদি মোর উঠল কাঁপি চরণের সেই রণনে ।
কোয়েলা ডাকল আবার, যমুনায় লাগল জোয়ার ;
কে তুমি আনিলে জল ভরি মোর দুই নয়নে ?
আজি মোর শূন্য ডালা কি দিয়ে গাঁথব মালা ;
কেন এ নিষ্ঠুর খেলা খেলিলে আমার সনে !
হয় তুমি থামাও বাঁশী, নয় আমায় লও হে আসি —
ঘরেতে পরবাসী থাকিতে আর পারিনে ।

— অতুলপ্রসাদ

করিও না হেলা

কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা, আমি পথের ভিখারী নহি গো ।
শুধু তোমারই দুয়ারে অন্ধের মত অন্তর পাতি রহি গো ॥
শুধু তব ধন করি আশ, আমি পরিয়াছি দীনবাস ;
শুধু তোমারই লাগিয়া গাহিয়া গান মর্মের কথা কহি গো ॥
মম সঞ্চিত পাপ পুণ্য, দেখ, সকলি করেছি শূন্য ;
তুমি নিজ হাতে ভরি দিবে, তাই রিক্ত হৃদয় বহি গো ॥

— অতুলপ্রসাদ

গ্রন্থপঞ্জী — (ক)

(সংস্কৃত)

মুখ্যতঃ যে সকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি

তার তালিকা নিম্নরূপ —

(সংস্কৃত গ্রন্থ)

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকারের নাম	প্রকাশক ও সংস্করণ-পরিবেশক
অমর কোষ	অমর সিংহ প্রণীত বিষ্ণুদত্ত শর্মা অনূদিত	সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ৩৮, বিধান সরণী কলি-৬
অথর্ববেদ সংহিতা	শ্রী বিজন বিহারী গোস্বামী এম.এ.কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্তদর্শন-বেদান্ততীর্থ - ভাগবতশাস্ত্রী অনুবাদ ও সম্পাদনা	হরফ প্রকাশনী, ১২৬ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলি - ১২
উপনিষদ্ সমগ্র	দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (ঈশ - কেন-কঠ-মণ্ডুক - প্রশ্ন - মাণ্ডুক উপনিষদ)	ঝামাপুকুর লেন
উপনিষদ্ সমগ্র		হরফ প্রকাশনী, ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি - ৭
ঋক্‌বেদ সংহিতা ১ম খণ্ড	রমেশ চন্দ্র দত্ত অনুবাদ অবলম্বনে ভূমিকা শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	হরফ প্রকাশনী, ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি - ৭
ঋক্‌বেদ সংহিতা ২য় খণ্ড	রমেশ চন্দ্র দত্ত অনুবাদ অবলম্বনে ভূমিকা শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	হরফ প্রকাশনী, ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি — ৭
ঋক্ সংহিতা	ডঃ শ্রীতানাথ গোস্বামী, ডঃ হিমাংশু নারায়ণ চক্রবর্তী	সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ৩৮, বিধান সরণী, কলি -৬

কাব্যাদর্শ	দণ্ডী এস.কে. বেলভাকর সম্পাদিত	সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার (পরিবেশিত), ৩৮, বিধান সরণী, কলি – ৬
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবদ ধর্ম	শ্রী গীতা সম্পাদক, শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষবিত্র, প্রকাশক – অনিল চন্দ্র ঘোষ	প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩
শ্রীশ্রী গীতগোবিন্দ	জয়দেব গোস্বামী কৃতম্ – সত্যেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত	জেনারেল লাইব্রেরী, ৩১২ডি, রবীন্দ্র সরণী (১১৫এ আপার চিৎপুর, কলি - ৬)
শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত	পরম ভাগবত — শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত	রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলি — ৯
দেবী-মাহাত্ম্য	পরিব্রাজক শ্রী মৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ বিরচিত	শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র বেলুড় মঠ হাওড়া
ধন্যালোক: ১ম ও ২য়ার্ধ	শ্রীমদানন্দবর্ধন	পুস্তকশ্রী, ৩৩।১ কলেজ রো, কলি - ৯
বিষ্ণু পুরাণম্	আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক সম্পাদিত ড: শ্রী শ্রী জীব ন্যায়তীর্থ কর্তৃক পরিশোধিত	নবভারত পাবলিশার্স, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি - ৯ প্রাপ্তিস্থান সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ৩৮, বিধান সরণী, কলি - ৬
শ্রীশ্রী বিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্রম্	অনুবাদক শ্রী দন্ডিস্বামী হৃষীকেশাশ্রম	শ্রী শঙ্কর মঠ কাঁকো ধানবাদ
বেদ	অধ্যাপক ব্যানার্জী ও হালদার (ব্যাখ্যাকার)	জে.এন. ঘোষ এন্ড সন্স ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি – ১২

বেদের পরিচয়	ড: যোগীরাজ বসু, ১৩৭৭	সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলি - ৬
বৃহৎ স্তব কবচমালা	শ্রী অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংকলিত	সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্ কলি - ১২
বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণম্	শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিতম্	মেসিন প্রেস্ ৩৪।১ কলুটোলা বঙ্গবাসী স্ট্রীট
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্	পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিতম্	পরিবেশক সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ৩৮, বিধান সরণী, কলি – ৬
শ্রীমদ্ভাগবত্ গীতা	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত	শ্রী রামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড়, হাওড়া
শ্রীমদ্ ভাগবতম্ দশমস্কন্দ, ১ম খন্ড	শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ - বেদব্যাস কৃতং মূলম্ শ্রীশ্রী বিবাস দাস ব্রহ্মচারীনা - মূদিতম্	শ্রী ভাগবত প্রেস্, ৪৯৮, চৈতন্যাব্দ
শ্রীমদ্ভাগবতম্	শ্রী কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ-বেদব্যাসকৃতম্ (মূলম্) অনুবাদক – ব্যাখ্যা – শ্রী মৎ বিজন বিহারী গোস্বামী এম.এ. কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন বেদান্ত তীর্থ - ভাগবত শাস্ত্রী	পরিবেশক মহেশ লাইব্রেরী কলি – ১২
ভারতীয় শক্তি সাধনা	উপেন্দ্র কুমার দাস	শান্তি নিকেতন প্রেস্, বীরভূম ১৩৭৩
মনুসংহিতা	মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিতম্	সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলি - ৬

মেঘদূতম্	মহাকবি কালিদাস প্রণীতম্ Sarada Ranjan Ray, M.A. Vidya vinode & Kumud Ranjan Raym MA. Ph. D. M.D. (H) ভিষজ জ্যোতিষাচার্য	সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলি - ৬
মহাভারতম্	বেদব্যাস	কলিকাতা, ১৮৩০ শকাব্দ
যজুর্বেদ সংহিতা	অনুবাদ ও সম্পাদনা শ্রী বিজন বিহারী গোস্বামী এম.এ. কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণব-দর্শন-বেদান্ততীর্থ- ভাগবতশাস্ত্রী	হরফ প্রকাশনী, ১২৬ কলেজ স্ট্রীট, মার্কেট, কলি - ১২
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা বা যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি মূল — অনুবাদসহ	পন্ডিত প্রবর মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত	সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলি - ৬
রঘুবংশম্	মহাকবি কালিদাস প্রণীতম্ শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য সম্পাদিতম্	সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলি - ৬
রামায়ণম্	মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীতম্	গীতা প্রেস, গোরখপুর ২য় সংস্করণ
শঙ্করাচার্য গ্রন্থমালা		বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা - ১২৮৭
সহস্রনাম স্তোত্রমালা	পন্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন সংকলিত ও পন্ডিত বামদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত	রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২ বিপ্লবী রাস বিহারী বসু রোড, ক্যানিং স্ট্রীট দ্বিতল, কলি - ১ পরিবেশক, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, বিধান সরণী কলি - ৬

স্তব কুসুমাঞ্জলি	স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত	উদ্বোধন কার্যালয়, ১ নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলি - ৩
সাধন সমর বা দেবী মাহাত্ম্য তিন খণ্ড	ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রী সত্যদেব	সাধন সমর কার্যালয়, কলি - ৭ ১৩৬১
স্তব-কবচমালা (পুরাণ-তন্ত্র-উপনিষদ্ ভক্তি গ্রন্থ হতে সংকলিত)	সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত	বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি – ১২
সাহিত্যদর্পন	বিশ্বনাথ কবিরাজ, শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি বঙ্গানুবাদ	সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮।১ বিধান সরণী, কলি - ৬
সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য দর্পণ	অধ্যাপক ব্যানার্জী ও হালদার	জে.এন.ঘোষ এন্ড সন্স, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২
সংস্কৃত সাহিত্যেতিহাস	আচার্য শ্রীরাম চন্দ্র মিশ্র	চৌখাম্বা বিদ্যাভবন বারাণসী, ১৯৭৩
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস	জাহ্নবী চরণ ভৌমিক পরিবর্ধিত	সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার , ৩৮ বিধান সরণী, কলি - ৬
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	ডঃ গৌরী নাথ শাস্ত্রী	পরিবেশনা- সংস্কৃত বুক ডিপো ২৮।১, বিধান সরণী, কলি-৬
সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্যে সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ	ডঃ শ্যামলী বসু	সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, বিধান সরণী , কলি-৬

সামবেদ সংহিতা	অনুবাদ ও সম্পাদনা, পরিতোষ ঠাকুর	হরফ প্রকাশনী, ১২৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি - ১২
A History of Vedic Literature	By- S.N. Sharma	The Chowkhamba Sanskrit Series office.= Varanashi I India 1973
A history of Ancient Sanskrit Literature	By- F. Max Muller Edited by- Dr. S.N. Shastri	- Do -

(খ) — (বাংলা)

ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী	কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত	বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলি-১২
উজ্জ্বল নীলমণি	রূপ গোস্বামী হরিদাস সম্পাদিত	
উনবিংশ শতাব্দীর	পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য ড: নিরঞ্জন চক্রবর্তী	
কবিকঙ্কন চণ্ডী		বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড্ ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি - ১২

করুণা নিধান বিলাস		জয়নারায়ণ ঘোষাল
কাব্যালোক ১ম খন্ড	ড: সুধীর কুমার দাসগুপ্ত	এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি. কলি - ৭৩
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	বড়ুচন্ডীদাস বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত	
কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী	রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন, ডি. লিট্.	
গাথাসপ্তশতী ও বৈষ্ণব পদাবলী	ড: নরেশ চন্দ্র জানা	সাহিত্যলোক ৩২।৭ বিডন স্ট্রীট্ কলি - ৬
গীত চন্দ্রোদয়	নরহরি চক্রবর্ত্তী হরিদাস সম্পাদিত	
গোবিন্দ লীলামৃত	শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ হরিদাস সম্পাদিত	
শ্রীচৈতন্যভাগবত	রাধাগোবিন্দ নাথ	সাধনা প্রকাশনী ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি - ৯
চন্ডীদাস পদাবলী ১ খন্ড	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত	
চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ২য় সংস্করণ	শঙ্করী প্রসাদ বসু	

চণ্ডীমঙ্গল (ধনপতি উপাখ্যান)	বিজন বিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত	
জগন দাস ও তাহার পদাবলী	বিজন বিহারী মজুমদার	
মধুগানের ঢপ কীর্তন	পাঁচকড়ি দে সম্পাদিত	পাল ব্রাদার্স এন্ড কোং কলিকাতা, ১৩৪৬
দাশরথি ও তাহার পাঁচালী	ডঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী এম.এ. ডি.ফিল,	এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি. বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি - ১২
দাশরথি রায়ের পাঁচালী	ডঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
পবনদূত	ধোয়া চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত	
পরমার্থ প্রসঙ্গে	মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ১ম - ৫ম	প্রকাশক - শ্রীজগদীশ্বর পাল, ১০, গ্যালিফ স্ট্রীট, (সুইট নং ১৩, ব্লক নং ১) কলি - ৩
বাঙালীর গান	শ্রী দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদন	১৩১২ সন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	ডঃ সুকুমার সেন । ১ম, ২য় খন্ড	
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	৪র্থ খন্ড, ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
বাংলা সাহিত্যের নাটকের ধারা	ডঃ বৈদ্যনাথ শীল	
বিদ্যাপতি - চন্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সুবোধ চন্দ্র মজুমদার	দেব সাহিত্য কুটীর প্রা. লি. ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলি - ৯
বৈষ্ণবপদাবলী ১ম সংস্করণ	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত	
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী	সম্পাদক ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্দ দাস	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলি - ৬
মহাভারত	কাশীরাম দাস	
স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী, ২য় খন্ড		শ্রীশ্রী ভোলানন্দ আশ্রম ১নং মহেশ চৌধুরী লেন, ভবানীপুর । কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কলি - ২৫

মনোমোহন গীতাবলী	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত	
রামায়ণ কৃত্তিবাসী	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ন সম্পাদিত ।	সাহিত্য সংসদ ৩২ এ আপার সার-কুলার রোড, কলি-৯
রামমোহন গ্রন্থাবলী	সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ২৪৩।১, আপার সার-কুলার রোড, কলি-৬
রবিরশ্মি	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিশ্লেষিত	এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি. ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলি - ৭৩
শ্রী রাধার ক্রমবিকাশ (দর্শনে ও সাহিত্যে)	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	
রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ	শ্রী প্রমথনাথ বিশী	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি - ৭৩
রবীন্দ্র রচনাবলী	পশ্চিমবঙ্গ সরকার শতবার্ষিকী সংস্করণ	
শাক্ত পদাবলী	অমরেন্দ্র নাথ রায় সম্পাদিত	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৩
সদুক্তিকর্ণামৃত	শ্রীধরদাস, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ।	

সমালোচনা সংগ্রহ ৯ম সংস্করণ		কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৫
সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা	ডঃ রামেশ্বর শ	২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলি - ৯
সাহিত্য জিজ্ঞাসায়		অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ (১ম ২য় খন্ড)		করুণা প্রকাশনী কলি - ৯
সাহিত্য সমালোচক মোহিত লাল মজুমদার	ডঃ মহেন্দ্র নাথ বৈরাগী	করুণা প্রকাশনী, কলি - ৯
সাহিত্য-বিচিন্তা	হরপ্রসাদ মিত্র	এস. ব্যানার্জী এন্ড কোং ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি - ৯
সাহিত্য - সঙ্গ	আব্দুল আজীজ আল - আমান	হরফ প্রকাশনী ১২৬ কলেজ ষ্ট্রীট কলি - ৭
সূক্তি মুক্তাবলী	ভগদত্ত জহলন পন্ডিত কৃষ্ণমাচার্য সম্পাদিত	
স্তোত্রাবলী	শ্রী হেরম্ব ভট্টাচার্য চতুর্থ সংস্করণ	এম. ভট্টচার্য এন্ড কোং হোমিও প্যাথিক ফার্মাসিস্ট এন্ড পাবলিশার্স । কলি - ৯

North Bengal University
Library
Raja Rammohanpur